# [illegible]ত্র ও কাব্য।


শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।


---


কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫নং চিৎপুর রোড।

৫ ভাদ্র ১৩০১ সাল।


---

মূল্য ১৲ এক টাকা।
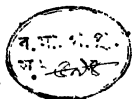
# উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাকা মহাশয়

শ্রীচরণেষু।

# বিজ্ঞাপন।

গত তিন বৎসরের সাধনায় চিত্র ও কাব্য সম্বন্ধে আমার যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারই কতকগুলি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই গ্রন্থে একত্র সন্নিবিষ্ট হইল।

গ্রন্থকার।

# সূচীপত্র।

# চিত্র ও কাব্য।
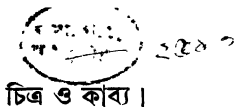
## কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা।

অলঙ্কারের নির্দ্দেশানুসারে মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইলেও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যের সহিত কালিদাসের রঘুবংশের একটা বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে কোনও মূল ঘটনা বা প্রধান চরিত্রের প্রভাব লক্ষিত হয় না—কেবলি ধারাবাহিক কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সম্পূর্ণ চিত্র একমাত্র কুলগৌরবসূত্রে সংযুক্ত। দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত ভালমন্দ অনেকগুলি রাজা—কেহ পুত্রাকাঙ্ক্ষায় তপোবনে ধেনু চরাইয়া বেড়ান, কেহ দিগ্বিজয়ী ধনুর্দ্ধর, কেহ প্রিয়বিরহে বিলাপ করিয়া আকুল, কেহ পিতৃসত্য পালনার্থে বনে বনে ফিরেন, কেহ বা প্রমদাজনবেষ্টিত হইয়া অহর্নিশি সুরাপানে কালক্ষয় করেন—প্রত্যেকের জীবনের মূল ঘটনা স্বতন্ত্র এবং কালভেদে একের জীবনের সহিত অপরের জীবনের ঘটনার বড় সম্পর্ক নাই। যোগ এই পর্য্যন্ত যে, দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এবং এইরূপে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক বংশাবলী।

রামায়ণ মহাভারত এরূপ কুলজী নহে। কুলের কথা তাহাতে অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়াছে মাত্র। সমগ্র কাব্যখানি সেই সূত্রে গ্রথিত বলা যায় না। কবির হৃদয়ে মনুষ্যত্বের যে চরম আদর্শ জাগিয়া ছিল সেই আদর্শকে মূর্ত্তি দিয়া তিনি রামকে গড়িয়াছেন। এবং রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রগুলিও রামেরই আনুষঙ্গিক।

মহাভারতে ঘটনারও যেমন অন্ত নাই, লোকেরও অন্ত নাই—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শত ধার্ত্তরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিদুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ—বিস্তর বড়লোক এবং প্রত্যেকেরই নিজত্ব বিশেষ পরিস্ফুট। কিন্তু এই বিবিধ ছোট বড় ঘটনা এবং বিচিত্র প্রধান অপ্রধান চরিত্রসমাবেশ কুরুক্ষেত্র-ব্যাপারেরই সূচনা। প্রতি ঘটনা এই মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বায়োজন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রলয়ের রঙ্গভূমিতে অভিনেতা।

রঘুবংশের বিষয় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বিবস্বতকুলের বর্ণনা। কোন মূল ঘটনাও নাই, বিশেষ নায়কও নাই, এবং রাজ-চরিত্রের একটা আদর্শস্থাপন কিম্বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যও দেখা যায় না। তবে এত বিষয় থাকিতে এক প্রাচীন বংশা-বলী বর্ণনায় কবির এত উৎসাহ কেন?

ইহার একটা কারণ এই মনে হয় যে, খণ্ড খণ্ড চিত্র-রচনায় কালিদাসের একটু যেন বিশেষ আনন্দ ছিল। শম্বুক যেমন অতি সহজেই আপনার চারিদিকে বিচিত্র চিত্রিত আবরণ নির্ম্মাণ করে, কালিদাসের প্রতিভা তেমনি দেখিতে

দেখিতে আপনাকে চিত্রময় শ্লোকে আবৃত করিয়া তোলে। ভবভূতি যেমন মানবপ্রকৃতিকে করুণারসে বিগলিত করিয়া লেখনামুখে নিঃস্থত করিতে ভালবাসিতেন, কালিদাস তেমনি মানবপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতিকে চিত্র-আকারে পরিস্ফুট করিতে ভালবাসিতেন। রঘুবংশের ন্যায় প্রায়-অসংলগ্ন সর্গপরম্পরায় এই ছবি আঁকিবার অনেকটা অবসর পাওয়া যায়। একটা চিত্রশালা দেখিয়া আসিলে যেমন মনের ভাব হয় সমস্ত রঘুবংশ পাঠ করিলেও সেইরূপ হয়। অনেকগুলি ফ্রেমে বাধানো ভাল ভাল ছবি।—দিলীপদম্পতির তপোবনে গমন। রঘুর নানা দেশে দিগ্বিজয়। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। দশরথের মৃগয়াগমন। রামসীতার রথযাত্রা। পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী। অগ্নিবর্ণের ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগ। এইগুলি ছবি—বাকি সমস্তই ফ্রেম।

রঘুবংশে চরিত্র যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা কেবল বর্ণনা মাত্র, চরিত্র রচিত হয় নাই। দিলীপের গুণগ্রাম কালিদাস নীতিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিখিয়াছেন মাত্র—অন্য নৃপতিদিগকেও সর্বাঙ্গীনভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিবার তেমন চেষ্টা হয় নাই। কেবল ছবিগুলির প্রতিই কালিদাসের টান।

এবং কালিদাস ক্রমাগতই চিত্রের পর চিত্র সাজাইয়াছেন। অনেক স্থলে একই পথবর্ণনার এক-একটি শ্লোকে এক-একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ পথ কখনও গ্রামের প্রান্ত দিয়া কখনও বনের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাকিয়া গিয়াছে—স্নিগ্ধ-

গম্ভীরনির্ঘোষ এক স্যন্দনে বসিয়া রাজা ও রাণী এই পথে গুরুগৃহে চলিয়াছেন। পথের দুইধারে কোথাও স্যন্দনবদ্ধদৃষ্টি হরিণমিথুন, কোথাও রথনেমিস্বনোন্মুখ ময়ূরদল, গ্রামগ্রান্তে মধ্যে মধ্যে ঘৃতভাণ্ডহস্তে ঘোষবৃদ্ধেরা রথের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়—রাজা তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহেন, তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন, রাজদর্শনে প্রীত হইয়া তাহারা গৃহে ফিরে।

এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সায়ংকালে রাজা দিলীপ সস্ত্রীক বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরাবিল তপোবন—কালিদাসের কল্পনার প্রিয় বিহারভূমি। উজ্জয়িনীর নাগরিকতা হইতে তিনি যেন এইখানে আপন মানসী আশ্রমে আসিয়া বিশ্রামলাভ করেন। কিন্তু এ তপোবনে তপস্যার কঠোরতা বড় নাই—কেবলি একটি পবিত্র হোমধূমাচ্ছন্ন নির্জ্জন গৃহাশ্রম। এখানে ঋষিপত্নীরা ব্রত আচরণ করেন, বিকালবেলায় উটজদ্বারে দাঁড়াইয়া অপত্যবৎ হরিণযূথকে নীবার রোমন্থ করিতে দেখেন, ঋষিকন্যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটহস্তে আলবালে জলসেক করিয়া থাকেন এবং সেকান্তে আলবালাম্বুপায়ী বিহঙ্গগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত দূরে সরিয়া দাঁড়ান। এখানে কেবলি স্নেহ দয়া মায়া, রমণীর শুভ্র কোমলতা - দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, সিংহাসন এবং চক্রান্ত নাই—শুধু শান্তি এবং সন্তোষ। কালিদাস ইহাই উপভোগ করেন - সরল হৃদয় এবং পবিত্র প্রীতিভাব,

বিকশিত সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য এবং সুডোল নিটোল গঠন, নিরলঙ্কার রমণীয়তা এবং বল্কলবদ্ধ বিমল যৌবন।

রাজদম্পতি এই তপোবনে পর্ণশালায় থাকিয়া ধেনুর সেবা করেন। প্রত্যহ প্রভাতে নন্দিনীকে লইয়া বনে বাহির হন এবং সায়ংকালে ঝিল্লিমুখরিত বনপথ দিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসেন। একদিন সহসা দেখিলেন, নন্দিনী নিকটে নাই—অদূরে শৈলগহ্বরের সম্মুখে এক সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে—নন্দিনী কাতরদৃষ্টিতে দিলীপের দিকে চাহিয়া। রাজা ধনুতে শরযোজনা করিলেন—কিন্তু নন্দিনীর মায়াপ্রভাবে তাঁহার হস্ত অসাড়—ধনুর্ব্বাণহস্তে যেমনটি তেমনি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালিদাসও চিত্রিতবৎ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং কেবল একটি সুন্দর চিত্রহিসাবেই ইহার সৌন্দর্য্য।

অবশেষে নন্দিনী প্রীত হইয়া রাজাকে অভিলষিত বরপ্রদান করিল। গুরু ও গুরুপত্নীর পাদবন্দনাদি করিয়া সস্ত্রীক দিলীপ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অল্পদিনমধ্যেই সুদক্ষিণার দোহদলক্ষণ দেখা দিল।

সুদক্ষিণা যখন অন্তঃসত্ত্বা, কালিদাস দিলীপের অন্তঃপুরে গিয়া এক একবার মহিষীকে দেখিয়া আসিয়াছেন। এবং গর্ভিণীর পাণ্ডু মুখশ্রী, মন্থরগতি, অলসভাব—পরিপূর্ণা দোহদশ্রী—এক আধটি মৃদু উপমায় চিত্রিত করিয়াছেন, কোথাও উষাকালীন ক্ষীণপাণ্ডু শশীর সাদৃশ্যে, কোথাও বা

পুরাতন পত্রাপগমে সন্নদ্ধমনোজ্ঞপল্লবা লতিকার সহিত তুলনায়।

শুধু ইহাই নহে, দু' একটি নিভৃত সুন্দর দাম্পত্যচিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। সন্তানসম্ভাবনায় মহিষীর আদর বাড়িয়াছে—রাজা যখন তখন অন্তঃপুরে আসিয়া প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, কি খাইতে ইচ্ছা করে, কি পরিতে সাধ যায়, ইত্যাদি। এবং ঘন ঘন সুদক্ষিণার মৃৎসুরভি আনন আঘ্রাণ করিয়া দিলীপের আর কিছুতেই পরিতৃপ্তি জন্মে না।

এই দোহদচিত্র রঘুবংশে আরও দু'একস্থলে দেখা যায়। রামচন্দ্রও একদিন আলেখ্যগৃহে বসিয়া অঙ্কনিষণ্ণা সীতাকে এমনি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কি সাধ যায়, এবং তদুত্তরে সীতা—বোধ করি, চতুর্দ্দিকের বনবাসবৃত্তান্তালেখ্যদর্শনে—আর একবার সেই ঋষিকন্যাপরিবৃত তপোবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দিলীপ রাজ্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলে রঘু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশদেশান্তরে দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। তখন শরৎকাল। উজ্জ্বল দিন। দূরবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে ইক্ষুচ্ছায়ায় বসিয়া কৃষকাঙ্গনারা গ্রাম্য কবিরচিত রঘুকর্তৃক ইন্দ্রবিজয় গাথা গাহিতেছে। রাজধানী সুরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে রঘু সেনাদলসহ যাত্রা করিলেন। পৌরাঙ্গনারা চতুর্দ্দিক হইতে লাজরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল।

চতুরঙ্গ সেনা যেখান দিয়া যায় ধূলায় আকাশ ছাইয়া ফেলে। মাতঙ্গকুল শুণ্ডের দ্বারা বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া পথ পরিষ্কার করিতে থাকে—বন উজাড় হইয়া যায়। জয়োল্লাসমত্ত রঘুসেনা কোথাও পার্ব্বত্যপ্রদেশে পানভূমি রচনা করিয়া তাম্বূলপত্রপুটে নারিকেলসুরাপানে কালহরণ করে। কোথাও নৌসেতু বাঁধিয়া, কোথাও বা হস্তীপৃষ্ঠে রঘু সসৈন্যে নদী পার হয়েন। এবং মদমত্ত সেনাগজগণের অবগাহনে সরিৎসকল মদগন্ধে আকুল হইয়া উঠে।

তাহার পর স্বয়ম্বরসভা। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভায় ভারতের যত সম্ভ্রান্ত নরপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন, কালিদাস প্রত্যেকের এক একখানি চিত্র আঁকিয়াছেন। এই রাজগণবর্ণনার মধ্যে দু'একটি মৃদুস্পর্শ টান দিয়া রূপসীর রূপের আভাসে তিনি চিত্রগুলিকে উজ্জল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রতিহারিণী সুনন্দা মগধ-ঈশ্বরের বর্ণনা করিতেছে—মগধরাজ বহু যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রকে নিজগৃহে রাখিয়াছেন এবং সেই অবধি বিরহিণী শচীর কেশবিন্যাস বন্ধ। দেবাঙ্গনাবাঞ্ছিত অঙ্গদেশাধিপতির বর্ণনা—অঙ্গরাজ যখন শত্রুদিগকে বধ করিলেন, তাহাদের রমণীরা মুক্তাহার ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে বসিল এবং মুক্তাফলস্থূল অশ্রুবিন্দু তাহাদের স্তনদেশে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। দুর্ব্বিষহতেজ মথুরাধিপ সুষেণ স্নিগ্ধকান্তি এবং নয়নাভিরাম—জলক্রীড়াকালে তাঁহার অন্তঃপুরিকাগণের স্তনচন্দনপ্রক্ষালনে কালিন্দীর নীল

জল যেন শুভ্র গঙ্গোর্ম্মিসংসক্ত হইয়া শোভা পায়। ইন্দুমতী একে একে নমস্কারপূর্ব্বক সকলকেই সসম্ভ্রমে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রমে অজের নাম, সুনন্দা বলিতে লাগিল—ইহাঁরই পিতামহ দিলীপ, যাঁহার শাসনে পথিমধ্যে নিদ্রিতা নর্ত্তকীর অঙ্গবসন উড়াইতে বায়ুও সাহস করিত না, পিতা রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে মৃণ্ময়পাত্র মাত্র রাখিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছেন, এবং কুলে শীলে রূপে গুণে ও নবীন যৌবনে ইনি তোমার তুল্য বর, ইহাঁকে বরণ কর, রতনে কাঞ্চনে মিলন হউক্। অজের গলদেশে বরমাল্য শোভা পাইল।

কেবলি রূপের তরঙ্গ। কালিদাসের প্রকাণ্ড চিত্রশালায় রূপসীর পর রূপসীর চিত্র সুবিন্যস্ত এবং সমগ্র প্রকৃতি অনুকূল প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত। আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেবল একটি চিত্রার্পিত মায়ারাজ্য—রূপযৌবনসমাচ্ছন্ন এবং রমণীয়।

রাজা দশরথ যখন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন তখন কোথায় অশ্বের হ্রেষারবে হস্তীর বৃংহিতধ্বনিতে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইবে, না, কালিদাস, স্ত্রী এবং বসন্ত এবং ললিত আদিরসে মৃগয়াকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। বসন্তকাল, গাছে গাছে নূতন পাতা, ডালে ডালে কোকিলকূজন, ফুলে ফুলে ভ্রমরগুঞ্জন, মৃদু মলয়ানিল, এবং মদনশরজর্জ্জর বিলাসবিভ্রম, পতির সহিত অঙ্গনাগণের বকুলমদ্যপান, ঢলাঢলি গলাগলি। রূপসী নহিলে মৃগয়া হয় না—অধরসুধার উত্তেজনা, নূপুর-

নিরুপের উদ্দীপনা এবং মদনশরের পরিচালনা ইহার প্রধান অঙ্গ।

রামায়ণের মৃগয়াবর্ণনা হইতে কালিদাসের মৃগয়াচিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রামায়ণে এসকল ললিত বর্ণনা কোথাও নাই। দশরথ যখন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন তখন তিনি যুবরাজ এবং অবিবাহিত। অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যার নিকট দশরথ এই মৃগয়াবৃত্তান্ত বলিতেছেন—

"দেবি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই, আমি যুবরাজ, এই অবস্থায় আমার কামোদ্দীপক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্য ভূমির রস আকর্ষণ-পূর্ব্বক কঠোর কিরণে সমস্ত জগৎ পরিতপ্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলে, তৎক্ষণাৎ উত্তাপ দূর হইয়া গেল, স্নিগ্ধ মেঘ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল। ভেক চাতক ও ময়ূরগণ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃক্ষ-শাখাসকল বৃষ্টির পতনবেগ ও বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গেরা বর্ষাগ্রে স্নাত ও পক্ষের উপরিভাগ সিক্ত হওয়াতে অতি কষ্টে তথায় গিয়া আশ্রয় লইল। মত্ত ময়ূরশোভিত পর্ব্বত নিরন্তর-নিপতিত জলধারায় আচ্ছন্ন হওয়াতে জলরাশির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। জল স্রোত স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইলেও গৈরিকাদি ধাতুসংযোগে কোথায় পাণ্ডুবর্ণ, কোথায় রক্তবর্ণ, কোথায়ও বা ভস্মমিশ্রিত হইয়া তথা হইতে ভুজঙ্গবৎ বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবি! এই সুখময় কালে মৃগয়া-বিহারে আমার ইচ্ছা হইল। তখন আমি রাত্রিযোগে নিপানে জল-পানার্থে আগত মহিষ হস্তী বা যে কোন জন্তু হউক, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শর শরাসন গ্রহণ ও রথারোহণ-পূর্ব্বক সরযূতটে উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আবৃত হইলে, ঐ অদৃশ্য সরযূর জলমধ্যে

করিকণ্ঠস্বরের ন্যায় কুম্ভপূরণরব শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া আমার হস্তী বোধ হইল। তখন আমি তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ সুতীক্ষ্ণ শর তূণীর হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলাম।" *

রামায়ণের এই মৃগয়াবর্ণনার পার্শ্বে কালিদাসের মৃগয়া সৌখীন বিলাস মাত্র। কালিদাস মৃগয়াবলম্বনে কেবল কতকগুলি সুন্দর চিত্র ফুটাইতে চাহেন বৈ ত নয়। রামায়ণের এই বর্ষাবর্ণনায় বাল্মীকি সেই অন্ধকার কালরাত্রির ভয়ঙ্করী ঘটনার পূর্ব্বসূচনা করিয়াছেন। বাল্মীকির চিত্রে একটি গম্ভীর ভাবনতা ব্যক্ত হয়। কালিদাসের চিত্র উজ্জ্বল এবং মধুর।

ভবভূতি হইলে মুনিপুত্রবধ লইয়া এইখানে অনেক করুণরস উদ্রেক করিতেন। বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া তিনি ঘন বর্ষার একটি গম্ভীর দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেন এবং সেই অন্ধকার দৃশ্যপটে ধনুর্ব্বাণহস্ত দশরথের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতেন। এবং বাণবিদ্ধ ঋষিবালকের করুণ বিলাপে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিত।

কালিদাস করুণরসে এমন পটু নহেন। দশরথের মৃগয়ায় মুনিপুত্রবধ ব্যাপারকে তিনি বড় প্রাধান্যই দেন নাই। যেখানে বা তাঁহার করুণরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে সেখানেও

---

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য চিত্রবিন্যস্ত। শোকের মধ্যেও তিনি রূপ এবং যৌবন, বিলাস এবং বিভ্রম চিত্রিত করেন, এবং এই রূপযৌবনবিভ্রমবিলাসের স্মৃতিতে তাঁহার দীর্ঘ বিলাপ রচিত হয়। প্রেয়সীর মৃতদেহ কোলে করিয়া অজ যেখানে বিলাপ করিতেছেন—ইন্দুমতীর চারু বিলাসগমন, নূপুর-নিক্বণসহিত অশোক তরুতে মৃদু পাদতাড়ন, কোথাও অসমাপ্ত মালাগাঁথার কাহিনী, ললিত কলাবিদ্যায় তাঁহার নিপুণতার কথা, কোথাও বা রূপসীর রূপের অতি মৃদু আভাস, কোথাও একটি সুন্দর উপমা—এমন করিয়া বলা যে, শুনিলেই মনে একটি চিত্র ফুটিয়া উঠে, শ্লোকের পর শ্লোক কেবলি চিত্রবিন্যাস।

সমস্ত রঘুবংশটিই এইরূপ চিত্রপরম্পরা। হৃদয়াবেগ অপেক্ষা চিত্রসৌন্দর্য্যই কালিদাসের কাব্যে সমধিক অভিব্যক্ত। এবং ঘটনা যৎসামান্য অবলম্বনে বর্ণনা বিচিত্র। রাম যখন সীতাকে লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, ঘটনা কিছুই নাই—কেবল আকাশপথে একখানি রথ চলিয়াছে এবং সেই রথে বসিয়া অযোধ্যার রাজদম্পতি। কিন্তু পথ দীর্ঘ এবং সমুদ্র নদনদী পাহাড় পর্ব্বতে দৃশ্য বিচিত্র। সুতরাং চিত্ররচনার এই অবসর। প্রথমেই সমুদ্রবর্ণনা—কতকগুলি চিত্র—কোথাও সেতুবন্ধে ফেনিল অম্বুরাশি আছাড়িয়া পড়িতেছে, কোথাও আকাশে সাগরে মিশাইয়া গিয়া এক অনন্ত বিস্তার, কোথাও তমালতালীবনরাজিনীলা দূর বেলাভূমি,

কোথাও বা গুটিকতক পৌরাণিক স্মৃতি—বিস্মৃত সগর-কাহিনী, পুরাতন মন্থনকথা—এবং ইহারই মধ্যে যেখানে অবসর ঘটিয়াছে সুবিধামত একটু আধটু অধরপানের প্রসঙ্গ। ক্রমে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া রথ জনস্থানের উপর দিয়া যাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে দেখাইতেছেন;—এই সেই স্থান, তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যেখানে আসিয়া তোমার চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখে বদ্ধ-মৌন একটি নূপুর কুড়াইয়া পাই, এই পর্ব্বতশৃঙ্গে একদিন—মনে পড়ে কি?—গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে পতির গাঢ় আলিঙ্গনমধ্যে মুদ্রিতনয়নে আপনাকে লুকাইয়াছিলে, আর ঐ অম্বরলেখি গিরিশৃঙ্গে একদিন বর্ষা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, কেকাধ্বনিতে কদম্বসৌরভে চারিদিক সমাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তোমার বিরহে সেদিন আমার জীবন অসহ্য বোধ হইয়াছিল, এই পম্পাসরোবরে—অহো।—তুমি তখন নিকটে ছিলে না, আমি নির্নিমেষনেত্রে শুধু ঐ চক্রবাকমিথুনের নীরব প্রেমালাপ দেখিতাম; সাশ্রুনয়নে এইস্থানে একদিন স্তবকা-ভিনম্র অশোকলতাকে দেখিয়া পীনপয়োধরা জনকতনয়া ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হই—ভাগ্যে লক্ষ্মণ ছিল, সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিল, দূরে ঐ পঞ্চাপ্সর বিহারবারি—সমাধিভীত ইন্দ্র একজন তপস্বীকে এইখানে অপ্সরাগণের যৌবনকূটবন্ধে আবদ্ধ করেন; আর এই সেই সুতীক্ষ্ণাশ্রম—সুতীক্ষ্ণের নিকট সুরাঙ্গনাদিগের বিভ্রমচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল,

সহাসপ্রেক্ষিতদৃষ্টি এবং বাজার্দ্ধসংদর্শিতমেখলা উভয়ই সফল হয় নাই ; ঐ সরযূ দেখা যায়—তরঙ্গহস্তদ্বারা আমাকে আলিঙ্গন জানাইতেছে। রথ আসিয়া থামিল। রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ করিলেন।

এতদিনে অযোধ্যার শ্রী ফিরিল। প্রাসাদসকল হইতে কালাগুরুধূম নির্গত হইতেছে—যেন রামচন্দ্র প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বহস্তে পুরীর বেণী মোচন করিয়া দিয়াছেন। রাম একদিন প্রাসাদশিখরে উঠিয়া অযোধ্যাপুরীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন—বিলাসী বিলাসিনীরা প্রমোদ-উদ্যানে বিহার করিতেছে এবং সরযূ পণ্যবাহিনী তরণীপরিপূর্ণা।

অগ্নিবর্ণের রাজত্বকালে এই বিলাস পূর্ণমাত্রায় উন্মুক্ত। রাজা বিলাসিনীপরিবৃত হইয়া অষ্টপ্রহর অন্তঃপুরেই থাকেন ; প্রজারা তাঁহার দর্শন পায় না, রাজকার্য্য মন্ত্রীবর্গ সুসম্পন্ন করেন। অন্তঃপুরে নিত্য মন্মথোৎসব। রাজা কামিনীগণের সহিত জলবিহার করেন—জলে বিলাসিনীদিগের নয়নাঞ্জন ও অধরের কৃত্রিম রাগ ধুইয়া যায় এবং স্বাভাবিক মুখরাগ অগ্নি-বর্ণকে অধিকতর প্রলোভিত করে। বিলাসিনীদিগের সহিত মনোরম পানভূমিতে বসিয়া তিনি বকুলের সুরা পান করিতে থাকেন এবং প্রমদাগণপ্রদত্ত মুখাসবপানে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন। রাজার এক অঙ্কে বীণা, অপর অঙ্কে অঙ্গনা, এবং সম্মুখে অবিশ্রাম নর্ত্তকীর লাস্যলীলা। প্রমদা হইতে প্রমদান্তরে, বিলাস হইতে বিলাসান্তরে অগ্নিবর্ণ নিত্য রমণ

করেন। বিপুল অন্তঃপুরেও কুলাইয়া উঠে না। লতাকুঞ্জে পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া পরিজনাঙ্গনাগণের সহিত প্রমোদালাপে কালক্ষেপ করিতে যান। বাদশাহী বিলাসিতাও এখানে হার মানে। এবং এই উৎকট উন্মাদনা রাজযক্ষ্মাকারে ব্যক্ত হইয়া অল্পদিনমধ্যেই অগ্নিবর্ণকে ঐহিক প্রমোদের বন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া লয়।

এইখানেই রঘুবংশের উপসংহার—এই বাদশাহী বিলাসের এক-সর্গ চিত্রপরম্পরায়। সুতরাং রঘুবংশ সম্বন্ধে আমাদের আর জানিবার বড় কিছু রহিল না। এবং এই উনবিংশ সর্গের মহাকাব্য হইতেই বোধ করি কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম।

কিন্তু ইহাই চরম নহে। কালিদাসের অন্য কাব্য আলোচনা করিলেও তাঁহার এই বিশেষত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। মেঘদূতের মত অমন সামান্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়া কেবল কাল্পনিক কথা লইয়া এমন একখানা সমগ্র কাব্য কালিদাসের পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় না। কিন্তু কালিদাসের চিত্রপ্রিয় কবিপ্রকৃতি কেবল ছবি আঁকিবার জন্য আপন মনের মত বিষয়টি বাছিয়া লইয়াছে। যক্ষের বিরহবর্ণনা উপলক্ষ্য মাত্র।

মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় কেবল এই চিত্রপরম্পরায়। কুবেরানুচরের দীর্ঘ পথ, বর্ষা বিরহ এবং অভিসারের মায়ারচনা। প্রতি বিরহিণীর দুঃখবর্ণনায় যক্ষ

আপন প্রেয়সীর বিরহবিধুরমূর্ত্তি আঁকিয়া রাঁচে, প্রবাসীর কথায় মেঘের নিকট আপন হৃদয় খুলিয়া দেখায়। অলকার প্রমোদবিলাস বর্ণনা করে—প্রতিযোগিতায় তাহার বিরহ যেন সমধিক ফুটিয়া উঠে। কিন্তু কেবলি চিত্র—ছবির পর ছবি।

এইরূপ চিত্র আঁকিতেই কালিদাস কিছু ভালবাসেন। বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যে সূচিভেদ্য অন্ধকারে লঘুগতি অভিসারিকা; মুক্ত বাতায়নে বসিয়া একবেণী বিরহিণী—উৎসঙ্গে বীণা পড়িয়া রহিয়াছে, মুখের গান মুখেই রহিয়া গিয়াছে, এবং চারিদিক হইতে শুধু মেঘমন্দ্রস্বরে শ্রাবণ ঘনাইয়া আসিতেছে, প্রবাসী রামগিরিশিখরে দাঁড়াইয়া মেঘের পানে চাহিয়া—মেঘ যদি দৌত্য-কার্য্য করে!

কুমারসম্ভবও কতকগুলি ছবি। প্রথমে হিমালয়ে বালিকা গৌরী। দ্বিতীয়তঃ শিবের তপোবনে যুবতী গৌরী। তৃতীয়তঃ গৌরীর তপোবনে বৃদ্ধ শিব। চতুর্থতঃ শিবের বিবাহ।

রতিবিলাপেও করুণরসে কালিদাসের হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই—তাহা নৈপুণ্যপরিপূর্ণ, কেবল মাঝে মাঝে এক একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথমেই কালিদাস রতিকে এক কথায় আঁকিয়া তুলিলেন—রতি বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনী। রতির আর বাঁচিবার সাধ নাই—স্বামীর অনুগমন ভিন্ন তাহার জ্বালা জুড়াইবে না। সেই রতি বিলাপ

করিতেছেন,

রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে
পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ।
বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়াঃ
ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ॥
নয়নাণ্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্
বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ
প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা॥" ইত্যাদি।

পরে পরে কতকগুলি ছবি—ঘন-অন্ধকার রাজপথে ঘনগর্জ্জন-ভীতা একাকিনী অভিসারিকা, বারুণীমদপানে অরুণনয়না স্খলিতবচনা প্রমদাজন, তাহার পর জ্যোৎস্না কোকিল মলয় লইয়া বসন্ত, কিন্তু মদনাভাবে এই সকলই নিষ্ফল—অতএব, হে মদন, তুমি ফিরিয়া আসিয়া ইহাদের গতি কর।

এ পর্য্যন্ত কালিদাসের প্রতিভাব যে বিশেষত্ব দেখা গেল শকুন্তলায় ইহার পূর্ণবিকাশ। বহিঃপ্রকৃতিতে চিত্রকরের মানসী প্রতিমা এইখানে যেন সম্পূর্ণরূপে আপনাকে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। সেইজন্য চিত্রগুলি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ।

প্রথমেই রথযাত্রা। রাজা দুষ্মন্ত রথারোহণে দ্রুতগামী কৃষ্ণসারের অনুসরণ করিয়াছেন, মৃগ প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং মনোহর গ্রীবাভঙ্গসহকারে মুহুর্মুহু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিতেছে। রথের গতিবেগ এত দ্রুত যে,

> যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
> যদর্দ্ধবিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
> প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো-
> র্ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে রথজবাৎ॥

ইহা নাট্যকলার বিরোধী। কারণ, অতিক্রত রথযাত্রা এবং তদবস্থায় রাজা ও সারথির কথোপকথন দৃশ্যকাব্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু কেমন ছবি!

তাহার পর তপোবনবর্ণনা। ক্রমে, আলবালে ঋষি-কন্যাদের জলসেচন এবং রাজাকর্ত্তৃক গোপনে তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ, শকুন্তলার নিবিষ্টচিত্তে রাজার ধ্যান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপ; শকুন্তলার বিদায়; রাজসভার দৃশ্য, অঙ্গুরীয়কপ্রাপ্ত রাজার উৎকণ্ঠা ও দূরে মহিষীর গান, সিংহ-শিশুর সহিত বালকের খেলা ও শিশুচিত্র।

এইগুলি একখানি ছবি নহে—ইহারই এক একখানি অনেকগুলি ছবির সমষ্টি। শকুন্তলা নাটকের বিশেষত্ব এই যে, তাহার প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনা এবং কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত যেন তুলি দিয়া আঁকা যায়। চিত্রকর যেমন রূপসীকে নানা অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া এবং নানা ভঙ্গীতে আঁকিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন, কালিদাস সেইরূপ বিচিত্র দৃশ্যে এবং বিবিধ ভাব ও ভঙ্গীতে যতরকমে সম্ভব শকুন্তলার সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। কোথাও বা কুরবকশাখার বল্কল বদ্ধ হইয়া যায়, কোথাও বা প্রিয়সখী বল্কলের দৃঢ়বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, কোথাও অবগুণ্ঠনের

মধ্য হইতে সুন্দরীর নব কিসলয়বৎ রূপলাবণ্য ফুটিয়া পড়ে ; সৌন্দর্য্যের কবি সৌন্দর্য্য ফুটাইতে ব্যাকুল—একটি বাহুভঙ্গী, একটি হৃদস্পন্দন, পাণ্ডু মুখকমলে অতি ক্ষীণ মৃদু অরুণিমা-সঞ্চার এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টির নিবিড় চাঞ্চল্যটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে না। যেখানে অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন—যেমন "স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ" আসিয়া শকুন্তলাকে লইয়া যাওয়া—সেখানেও কেবল একটি সুন্দর চিত্র ব্যক্ত হইয়াছে।

শকুন্তলা যদিও নাটক এবং উহার মধ্যে প্রকৃতিতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ তত্ত্ব থাকিতে পারে তথাপি শকুন্তলা আমাদের মনে প্রধানতঃ কতকগুলি চিত্রশ্রেণী টাঙ্গাইয়া দিয়া যায়। আমরা যে শকুন্তলার ঘটনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাই তাহা নহে, বরঞ্চ উহার স্থির মুহূর্ত্তগুলিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া রাখে—নাটকটি অগ্রসর হইতে হইতে যে যে স্থানে ছবি-আকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই সেই স্থানই আমাদের চোখে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠে।

যেমন, বিদায়দৃশ্য। শকুন্তলা অগ্রসর হইতে যান, পশ্চাৎ হইতে কে যেন টানিয়া রাখে, ফিরিয়া দেখেন তাঁহারই স্নেহপালিত মৃগশিশু অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে। প্রত্যেক তরু এবং লতা শকুন্তলার সুখদুঃখের সঙ্গী—বারবার তাহাদের কাছে দাঁড়াইয়া, তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া শকুন্তলা তপোবনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

রাজসভামধ্যে দুষ্মন্ত যখন প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখনও ঘটনা অধিক নয় এবং শকুন্তলা কথাও বড় বলেন নাই, কেবল সেই সভামধ্যে দুষ্মন্তকে 'পৌরব' সম্ভাষণ করিয়া যখন দাঁড়াইলেন, তখনই দুষ্মন্ত রাজসভা শার্ঙ্গরব শারদ্বত এবং এই দুই তপস্বীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মানা তেজস্বিনী তপোবনবালিকার একখানি উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিল।

কেবলমাত্র "অয়মহং ভোঃ" এইটুকুতে শকুন্তলার বিরহ চিত্রিত হইয়াছে। দুর্ব্বাসা এই বলিয়া আশ্রমের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন—কিন্তু তবু শকুন্তলা মাথা তুলিলেন না, তাঁহার মুখে কথা নাই।

এইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি রূপসীর চিত্র খাড়া করিয়া তুলিতে পারিলে কালিদাসের ফূর্ত্তি ধরে না। সুখে দুঃখে বেদনা বিলাসে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যেন কিছু সস্নেহ সহৃদয়তা দেখা যায় এবং স্ত্রীসঙ্গে তিনি একটু বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

নারী এবং প্রকৃতিসৌন্দর্য্যের প্রতি এমন নিবিড় প্রেম অন্য কোন কবিতে দেখা যায় না। যেখানে তপোবনের মধ্যে ঋষিবালিকার সমাবেশ করিয়াছেন সেখানে তাঁহার সেই দুই অনুরাগের একত্র মিলন হইয়াছে। নগরবাসী রাজা, তপোবনের পালিত মৃগসেবিত তরুকুঞ্জের মধ্যে একটি ঋষিকুমারীর—একটি অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া যে একটি নাট্যব্যাপার ঘটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা যেন

কবির নিজের কামনাস্বপ্ন। আত্মপ্রকৃতির সমগ্র অনুরাগ সেচন করিতে পারেন কালিদাস এমন একটি বিষয় সৃজন করিয়া লইয়াছেন, এই জন্য সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে শকুন্তলা এমন একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কেবল চিত্ররচনা নহে, খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনাতেই কালিদাসের প্রতিভার বিশেষ পটুত্ব। পাঠকেরা তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। পথের বর্ণনা করিতে কালিদাস বড় ভালবাসেন। তাহার কারণ পথের দুইপার্শ্বে খণ্ড খণ্ড চিত্র পরে পরে চক্ষের সমক্ষে উপনীত হয়; একটার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া তাহার পরেই আর একটার প্রতি চক্ষু পড়ে। একটা সমগ্র সম্পূর্ণ বৃহৎ চিত্র রচনা করিতে হয় না। সমস্ত রঘুবংশ যেন ইক্ষাকুবংশের একটি দীর্ঘ প্রাচীন রাজপথ। কবি রথে চড়িয়া বর্ণনা করিতে করিতে চলিয়াছেন। দিলী-পের প্রথম চিত্র রথযাত্রা। রঘুর দিগ্বিজয়ও এই ভাবের, দেশ হইতে দেশান্তরে, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে গমন। ইন্দু-মতীর স্বয়ম্বরসভাতেও কবির প্রতিভা দুইপার্শ্বের শ্রেণীবদ্ধ রাজগণকে অবলম্বন করিয়া এক একটি দৃশ্যকে পরে পরে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। রামের রথযাত্রাতেও কবিপ্রতিভার সেই গতি-লীলা প্রকাশ পায়। অগ্নিবর্ণের বিলাসসম্ভোগও সেইরূপ; প্রমোদ হইতে প্রমোদান্তরে অপরিতৃপ্ত চপল হৃদয়ের ভ্রমণচাঞ্চল্য। মেঘদূত কাব্য মেঘচ্ছায়াস্নিগ্ধ দুই-পার্শ্বের ছবি তুলিতে তুলিতে ভ্রমণ। ঋতুসংহার সম্বন্ধেও

এ কথা খাটে। অমনতর নিতান্তই বর্ণনাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। ঠিক পথবর্ণনা নহে বটে—কিন্তু ইহাও চলিতে চলিতে বর্ণনা। বিক্রমোর্ব্বশী যদিও নাটক, কিন্তু কবি নাট্যরীতি পরিহার করিয়া নায়ককে অরণ্যে অরণ্যে বিলাপপূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়াছেন। কখনও পাখী, কখনও মেঘ, কখনও লতা, কখনও পর্ব্বতের প্রতি খণ্ড খণ্ড উচ্ছ্বাস।

এইরূপ খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে অনেক সময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সমুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় প্রকৃতির বিরাট দৃশ্যে কবি যদি একমুহূর্ত্তে দৃশ্যের সমস্ত বৃহত্ত্ব চক্ষের সমক্ষে খাড়া করিয়া না তুলিতে পারেন তবে যে চিত্রই ব্যর্থ হয়। কারণ, বিরাটত্বই তাহার প্রধান ভাব, তাহার খণ্ড খণ্ড আংশিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে প্রাধান্য দিলে তাহার প্রকৃত ভাবটাকেই খর্ব্ব করা হয়। পর্ব্বতে যে চমরী লাফাইতেছে বা ওষধি জলিতেছে বা গজমুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে তাহা চিত্রিতব্য বিষয় নহে—কারণ, বৃহৎ হিমালয়ের মধ্যে তাহারা কে কোথায় বিলীন হইয়া থাকে তাহা চিত্রকরের দৃষ্টিগোচর হওয়াই উচিত নহে। কিন্তু কালিদাস নিপুণ চিত্রকর হইয়াও তাঁহার অতিনৈপুণ্যবশতই হিমালয় ও সমুদ্র বর্ণনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র বর্ণনায় লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। ভবভূতি যেখানে একটিমাত্র মেঘমন্দ্রসমাসে বিন্ধ্যপর্ব্বতের

অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলেন, কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না।

---

# উত্তরচরিত।

উত্তররামচরিত কালিদাসের কাব্যের মত কেবলি মধুর ও সুন্দর চিত্রপরম্পরার সমাবেশ নহে, সেখানে মেঘমন্দ্রসমাসে যেমন প্রকৃতির নিবিড় নিশ্চল গাম্ভীর্য্য মুদ্রিত হইয়া উঠে, তীব্র করুণ আবেগে সেইরূপ মানবহৃদয়ের সমস্ত গভীর সুখ দুঃখ, বেদনা আনন্দ প্রগাঢ় হইয়া আসে; এবং এই নির্ঝরঝঙ্কৃত উত্তাল তরঙ্গকল্লোলিত প্রচণ্ড প্রকৃতি মানবের মেঘমেদুর অন্তরে ঘনীভূত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। কালিদাসের চিত্রশালা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভবভূতির কাব্যজগৎ যেন এক সম্পূর্ণ নূতন দেশ—এখানেও সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য সুবিন্যস্ত এবং মানবহৃদয় বহিঃ-প্রকৃতির সহিত নানা অদৃশ্য-সূত্রে গ্রথিত হইয়া আপনাকে নানা ভাবে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু কালিদাসের চিত্রশালায় মন যেরূপ ভ্রমরবৎ চিত্র হইতে চিত্রান্তরে, সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যান্তরে, উপমা হইতে উপমান্তরে নীত

হয় এবং নানা ফুল হইতে কেবল মধুর সৌন্দর্য্যটুকু সঞ্চয় করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে, ভবভূতির দৃশ্যকাব্যে মন্ত্র সেরূপ হিল্লোল সঞ্চারিত হয় না—চক্ষের সম্মুখে ঘন-নিবিড় অরণ্যানীর নীরন্ধ্র নিচুলনীলিম একটি গম্ভীর দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত হয় এবং দূর দিগন্তপটে মুদ্রিত মেঘমালাবৎ নীল শৈলশ্রেণী, গদ্গদভাষিণী নদী গোদাবরী, নিরন্তরধ্বনিত নিবিড় নির্জ্জনতা সমস্ত মিলিয়া সেই নিবিড়তা আরও নিবিড়তর করিয়া তুলে; একটি সমগ্র সংহত দৃশ্যগাম্ভীর্য্যে মন অভিভূত হইয়া পড়ে। কালিদাস যেখানে ফুলটি, মালাটি, মদরাগ ও চুম্বনবিলাস এবং তদানুষঙ্গিক সুন্দর জ্যোৎস্না, মধুর মলয় ও উদ্ভিন্নযৌবনা প্রকৃতি দিয়া খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য্য উদ্রেকে প্রিয়জনকে স্মরণ করাইয়া দেন, ভবভূতি সেখানে অন্তরের অন্তরে ডুবিয়া মানবহৃদয়ের গভীর বেদনা অনুভব করেন এবং সেই বেদনার মধ্য হইতে প্রিয়জনকে যেন মন্থন করিয়া তুলেন, সেইজন্য প্রিয়জন তাঁহার নিকট এমন কি-জানি-কি এবং প্রিয়স্পর্শে তিনি একেবারে আকুল হইয়া উঠেন—নিশ্চয় করিতে পারেন না, সুখ না দুঃখ, প্রবোধ না নিদ্রা, শরীরে বিষসঞ্চার হইয়াছে অথবা মদিরা পান করিয়াছেন, চৈতন্য লুপ্ত কি উন্মীলিত।

সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এবং সকল হৃদয় দিয়া ভবভূতি প্রিয়জনকে অন্তরের অন্তরদেশে যতই চাপিয়া ধরেন, সে কি-জানি-কিকে সম্যক্ অনুভব করিয়া উঠা যায় না, অঙ্গ অবশ হইয়া আসে,

চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে, ভবভূতি আত্মহারা হইয়া যান, কিন্তু প্রিয়জন ততই কিম্জানি-কি। উত্তরচরিত নাটকের সপ্ত অঙ্কের মধ্য দিয়া বরাবর এই একটি করুণ বেদনা সঞ্চারিত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেন কোন্ প্রিয়াকুল করুণ হৃদয় আপন গোপন মর্ম্মস্থলে প্রিয়-জনকে বিদ্ধ করিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া আপনাকে তাহাতে ক্ষীণ করিতেছে এবং সেই নিবিড় মর্ম্মনিপীড়িত বেদনা কোথাও দেহ অবলম্বনে, কোথাও হৃদয় অবলম্বনে, কোথাও চিত্র অবলম্বনে, কোথাও বা ছায়া অবলম্বনে, অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তরচরিতে তবে সুখ কি নাই? কেবলি একটি ধারা-বাহিক করুণ ব্যাকুলতা? কেবলি হা হতোস্মি, হা রাম, হা সীতে, কিম্বা কোথা প্রিয়ে, প্রাণনাথ, এবং অন্তর্বাষ্পাবস্থা ও সাশ্রুনয়ন? লক্ষ্মণ যখন পিতৃবিচ্ছেদে দুর্ম্মনায়মানা সীতা-দেবীকে তাঁহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্তের চিত্রগুলি দেখাইতেছেন, তখন কি সকলের মনে সুখসঞ্চার হয় নাই? নিদ্রালসে শিথিলাঙ্গী আলিঙ্গনবদ্ধা সীতার স্পর্শে রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে যে পুলক সঞ্চার হইয়াছিল সে কি সুখ নহে? দীর্ঘ বিরহ-নিশাবসানে সীতার সহিত রামের যখন মিলন সম্পাদিত হইল তখন কি সুখের সীমা ছিল?—কিন্তু ভবভূতির কাব্যে সুখও যেন অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া অনেকটা দুঃখেরই মত হইয়া আসে। হয়, তাহার সহিত কতকগুলি দুঃখকাহিনী

বিজড়িত, নয়, তাহার মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য বিবশ ব্যাকুলতা—সুখ কি দুঃখ নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন; যদি বা মিলন হয়, মিলনের মাঝখানে যেন শতবর্ষের বিরহ জাগিয়া থাকে এবং মিলনান্ত উপসংহারেও পুরাতন বিরহ পরিতৃপ্ত হয় না। কালিদাসের কাব্যে যেমন দুঃখও বিলাস-অলসিত মোহন মধুরবেশে কতকগুলি সুন্দর চিত্রবদ্ধ হইয়া মোহ উদ্রেক করিয়া দেয়, ভবভূতির কাব্যে সুখ সেইরূপ মর্ম্মস্থলে বেদনা-বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত করুণ ও নিবিড় হইয়া উঠে।

নাট্যারম্ভের অল্পক্ষণমধ্যেই সীতার বিনোদনজন্য চিত্রিত কতকগুলি আলেখ্য লইয়া লক্ষ্মণ যখন প্রবেশ করিলেন, রামচন্দ্র ও সীতাদেবী অষ্টাবক্রকে সবেমাত্র বিদায় দিয়া নিভৃতে বসিয়া আছেন। লক্ষ্মণের আগমনে প্রথম সেই নীরবতা ভঙ্গ হইল। রামচন্দ্র আলেখ্যের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, ইহাতে কি অবধি চিত্রিত হইয়াছে? লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যা বধূঠাকুরাণীর অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত। প্রিয়াগতপ্রাণ রামচন্দ্রের নেত্রপল্লব সিক্ত হইয়া আসিল, তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, হায়, জন্মপরিশুদ্ধাকেও আবার অগ্নিতে শুদ্ধ করিয়া লইতে হইল। সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে, তোমার প্রতি যে রুক্ষ আচরণ করিয়াছি তাহা সর্ব্বথা তোমার অযোগ্য, অপরাধ মার্জ্জনা কর। সীতা তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্য আলেখ্যের প্রতি রামের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন।

সে বহুদিনের কথা, প্রথম যখন আর্য্যপুত্র, ঋষি বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে, মিথিলায় শুভাগমন করেন—উদ্ভিদ্যমান নবনীলোৎপলশ্যাম স্নিগ্ধ মসৃণ চারুদেহ, সৌম্য সুন্দর মুখশ্রী, কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভঙ্গ করিতেছেন—পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাত জনক, বিস্মিত দৃষ্টি বালকের মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ করিয়া নিশ্চল। সেই শুভ বিবাহ-রজনী—মঙ্গলাচার, হুলুধ্বনি, ব্রাহ্মণবর্গ ও ঋষিগণপরিবৃত সুভামণ্ডপ—চারি ভ্রাতার চারি বধূ—অত দশরথ বধূসমাগমে পরিপূর্ণহৃদয়। জানকীকে দেখিয়া মাতৃগণের কি আনন্দই হইয়াছিল! বালিকার অনতিনিবিড সূক্ষ্ম দন্তপংক্তি, উভয় গণ্ডদেশে চারু অলকাবলী আসিয়া পড়িয়াছে, চন্দ্রকরনির্ম্মল মনোহর মুখশ্রী, বিভ্রমবিলাসহীন সরল অঙ্গযষ্টি। তখন জীবন অতি লঘু—তাত জীবিত—ভাবনা নাই চিন্তা নাই, দিনগুলি নিশ্চিন্তমনে কাটিয়া যাইত। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

লক্ষ্মণ একটির পর একটি চিত্র উল্টাইয়া যাইতেছেন, এবং পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলি সকলের চক্ষের সমক্ষে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতেছে। সীতারামকে বলিতেছেন, কখনও বা রাম সীতাকে বলিতেছেন, সেই দিন স্মরণ হয় কি ?—এই সেই কালিন্দীতটস্থ শ্যামবট—হে প্রিয়ে, এখানে একদিন পথশ্রমে ক্লান্তদেহ তুমি আমার বক্ষের মধ্যে গাঢ় আলিঙ্গনে রুদ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিলে। ঐ যে সেই বিন্ধ্যাটবীর প্রবেশদ্বার—আর্য্যপুত্র হস্তস্থিত তালবৃন্তের দ্বারা এইখানে

একদিন আমার আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ দেখাইয়া দিলেন, দূরে ঐ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষসমূহে নিরন্তর-স্নিগ্ধনীলপরিসর গোদাবরীমুখরিত অরণ্যপ্রদেশ দেখা যায়, বনভূমির মধ্য হইতে মেঘমেদুরিতনীলিমা প্রস্রবণগিরি উঠিয়াছে। রামচন্দ্র সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পর্ব্বতের পর্য্যন্তভাগে গোদাবরীশিশিরকণাসম্পৃক্ত বায়ুসেবনে আমাদের বিজন স্বচ্ছন্দসঞ্চরণ মনে পড়ে কি? কপোলে কপোল সংসক্ত এবং পরস্পরকে প্রগাঢ় বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া সুখপর্ণশয্যায় অবিরত মৃদু গল্পগুঞ্জনে অজ্ঞাতসারে নিশাতিবাহন মনে পড়ে কি? লক্ষ্মণ আর একটি চিত্র উদ্‌ঘাটন করিলেন—রামচন্দ্রের সেই প্রথম বিবহ। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চোখ ফুলিয়াছে এবং অধর ও নাসাপুট রুদ্ধ আবেগে ঈষৎ স্ফুরিত। রামচন্দ্র বলিলেন, বৎস, বৈরপ্রতিমোচন-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তৎকালে কোনরূপে এ দারুণ বিরহও সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দুঃখাগ্নি পুনঃপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া দুর্মর্ম্মব্রণের ন্যায় অন্তরে অত্যন্ত দুঃসহ বেদনা দিতেছে। এইরূপ বহুতর চিত্রের মধ্য দিয়া গিয়া সেই প্রসন্নগম্ভীর বনরাজি এবং চিরাকাঙ্ক্ষিত পবিত্রসৌম্যশিশিরাবগাহা ভাগীরথী—যাহা দেখিয়া সীতার মন তপোবনের জন্ম অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং রামচন্দ্র অচিরেই তাঁহার দোহদাভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সকল চিত্রগুলি আমরা অবশ্য এখানে উল্লেখ করিলাম

না। ঊর্মিলার চিত্র লইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতার মৃদু পরিহাস "বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা", শূর্পণখাকে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীজনোচিত ভীতিভাব, মন্থরার চিত্র হইতে অবিচলিত অবলীলাক্রমে রামের চিত্রান্তরে গমন, এই সকলের মধ্যে কাব্যকলা যথেষ্ট আছে। এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস প্রথম পরিচ্ছেদের কল্যাণে বঙ্গীয় পাঠকসমাজে তাহা অপ্রকাশও নাই। আমরা যে চিত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি সেইগুলি হইতে কালিদাসের বর্ণনার সহিত ভবভূতির বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিবার কতকটা সহায়তা হইতে পারে বোধ হয়।

কালিদাসও এই পথ দিয়া দু'একবার যাত্রা করিয়াছেন। এবং ভবভূতি যে তরুসমাচ্ছন্ন গোদাবরীপ্রদেশ, হংসকারণ্ডবাদিবিচরিত কমলশোভিত রমণীয় পম্পাসরোবর ও ককুভসুরভিত নীল স্নিগ্ধ নূতন তোয়বাহবেষ্টিত মাল্যবান্ শৃঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাসের লেখনী তাহার একটিকেও পরিত্যাগ করে নাই এবং এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহারও মনে পল্লীগতপ্রাণ রামচন্দ্রের বিরহ উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। রামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন, এইখানে বেতসকুঞ্জে গোদাবরীতরঙ্গশীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে তোমার উৎসঙ্গে মস্তক রাখিয়া কত নিশি যাপন করিয়াছি; এই মাল্যবান্ গিরি—নূতন মেঘবারির সহিত এইখানে আমারও বিরহজনিত নেত্রজল পতিত হইয়াছিল; নবোদকসিক্ত

পদ্মগন্ধ, অর্দ্ধোদ্গতকেশর কদম্বপুষ্প, শিখিকুলের কেকা-ধ্বনি তোমার বিরহে অসহ্য বোধ হইয়াছিল, মেঘগর্জ্জনে ভীত হইয়া তুমি যে গাঢ়ভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে তাহারই স্মৃতি লইয়া গুহ্যর গুহায় প্রতিধ্বনিত ঘন-গর্জ্জন অতি কষ্টে সহ্য করিতাম; ঐ পম্পাসর—অয়ি প্রিয়ে ঐখানে চক্রবাকমিথুন ক্ষণমাত্র বিযুক্ত না হইয়া পরস্পরের মুখে পদ্মের কেশর প্রদান করিত, তাহা দেখিয়া বহু কষ্টে আমি তোমার বিরহ যাপন করিতাম, পম্পাতটে ঐ স্তনাভি-রামস্তবকাভিনম্রা তন্বী অশোকলতাকে দেখিয়া তোমা ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলাম। ইহার পর যেখানে ঋষ্যাশ্রম আসিয়াছে, সুরাঙ্গনাগণের ব্যর্থ বিভ্রমচেষ্টা দিয়া তপঃপ্রভাব প্রদর্শনচ্ছলে কালিদাস রূপসীর উন্মুক্ত যৌবন বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং গিরিপাদপ্রবাহিত নগনদীদর্শনে মুক্তাহারবিন্যস্ত পীনপয়োধর চিত্রিত করিয়াছেন। ভবভূতির বর্ণনায় মাল্যবান্ চিত্র দেখিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কেবল বলিয়াছেন, বৎস, থাক্ থাক্, আর পারি না, আমার জানকী-বিপ্রয়োগ পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হইতেছে; পম্পাসরোবরে অশ্রু-জলের আভাস আছে মাত্র; এবং ঋষ্যাশ্রম ও প্রকৃতিদর্শনে কেবল সরল গম্ভীর ভাষায় তাহার বিরলোপমা বর্ণনা।

কিন্তু ভবভূতির পরিচয় এ পর্য্যন্ত আমরা অল্পই পাই-য়াছি। চিত্রদর্শনে এই বেদনাবিদ্ধ কবিহৃদয়ের একাংশমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইয়া গেলে সীতাদেবী

বাহুপাশে রামচন্দ্রের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বাতায়নসন্নিহিত নিভৃত প্রদেশে শয়ন করিলেন। সেই স্পর্শটুকুমাত্রে ভবভূতির সমস্ত বেদনা যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। একখানি নবনীসুকুমার কোমল করস্পর্শ—শুধু একটা আত্মবিস্মৃত অনির্দ্দেশ্য আবেগের মত। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,

প্রিয়ে কিমেতৎ

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ।

বহুবর্ষ পরে নাইটিঙ্গেলের কণ্ঠস্বরে একজন বিদেশী কবির হৃদয়ে অনেকটা এইরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

"My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk."

শুধু কি তাই? গান শুনিতে শুনিতে কীট্‌সেরও রামচন্দ্রের দশা ঘটিয়াছে—"প্রবোধো নিদ্রা বা"—"Do I wake, or sleep?"

রামচন্দ্রের বাহূপরি মস্তক রাখিয়া সীতা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিবাহসময় হইতে গৃহে বনে, শৈশবে যৌবনে চিরদিনই এই বাহু তাঁহার উপাধান হইয়া আসিয়াছে। নিদ্রা-

বস্থার স্বপ্ন দেখিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র, আছ ত?" রামচন্দ্র স্নেহভরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে করস্পর্শ করিলেন। সীতা তাঁহার গৃহের লক্ষ্মী, নয়নের অমৃতশলাকা, সীতার স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে বহুল চন্দনরস লেপন, কণ্ঠদেশে এই বাহু শিশির-মসৃণ মুক্তাহার; অসহ্য বিরহ ভিন্ন সীতার কিই না প্রিয়? "হা আর্য্যপুত্র, সৌম্য, কোথা তুমি?" চিত্রদর্শনজনিত বিরহভাবনা স্বপ্নাবস্থায়ও প্রিয়ার চিত্তোদ্বেগ ঘটাইতেছে।

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু য-
দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥

সুখে দুঃখে একরূপ, সর্ব্বাবস্থাতেই অনুকূল, হৃদয় যাহাতে বিশ্রাম লাভ করে, বয়সে যাহার রসক্ষয় হয় না, কালক্রমে লজ্জা ভয় সঙ্কোচ অপগত হইয়া যাহা পরিণত স্নেহসারে অবস্থিতি করে, সুমানুষের সেই অদ্বিতীয় নিরুপধি প্রেম কত পুণ্যেই পাওয়া যায়।

এমন সময়ে দুর্ম্মুখ আসিয়া সেই দারুণ লোকাপবাদ-সংবাদ নিবেদন করিল। কোথায় এত প্রেম? কোথায় সেই চিরন্তন পত্নীগতপ্রাণতা? প্রবল কুলগৌরব আসিয়া বলিল, সীতাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। হৃদয় বলিল, সীতা যে নিরপরাধিনী। আর, হে রাম, সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া তোমার জীবনধারণে প্রয়োজন কি? তোমার জগৎ ত সীতাবিহনে

জীর্ণারণ্য। ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্ক মোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অখণ্ড প্রেম সমস্ত প্রজাপুঞ্জের প্রীতি হইতেও গুরুতর ও উচ্চতর, যে অদ্বিতীয় প্রীতি, শুধু ইক্ষ্বাকুবংশ কেন, সমস্ত মানবকুলের জীবন, তাহাকে অকারণে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া কলঙ্কক্ষালন কিরূপ? তবে আশৈশব এত করিয়া সীতাকে পোষণ করিলে কেন? সৌনিকবৃত্তিই যদি অবলম্বন করিবে, ক্ষুদ্রী পক্ষিণীকে বক্ষনীড়ে টানিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন ছিল? কুলগৌরব বলিল, ও কথা নয়; তুমি রাজা, তুমি দশরথের পুত্র, রঘুর প্রপৌত্র, সূর্য্য তোমার আদিপুরুষ স্মরণ রাখিয়ো, তুমি শুধু সীতার স্বামী নহ, সসাগরা ধরিত্রী তোমাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাঁহাকে ভুলিয়ো না; পত্নী ত্যাগ কর—নহিলে, আজ তুমি রাজা হইয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইবে তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ গৃহে বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে, তুমি রাজা, তুমি শুধুমাত্র প্রেয়সীর প্রেয়ান্ নহ, দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া চিরন্তন বিধি রক্ষা কর। রামচন্দ্র কুলগৌরবের নিকট শির নত করিলেন। হৃদয় বলিতে লাগিল—কি করিলে! হায় রামচন্দ্র, কি করিলে!

দ্বিতীয় অঙ্কে ঘটনা বড় নাই। একটি সুন্দর বিষ্কম্ভক—সেই বিষ্কম্ভকে ঋষিপত্নী আত্রেয়ী ও বনদেবতা বাসন্তীর কথোপকথনচ্ছলে দ্বাদশবৎসরের ঘটনাবলী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, সীতার যমক সন্তান প্রসবানন্তর রসাতলপ্রবেশ, সন্তানদ্বয়ের বাল্মীকি-আশ্রমে অবস্থান, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ

যজ্ঞের উদ্যোগ, লক্ষ্মণাত্মজ চন্দ্রকেতুর প্রতি অশ্বরক্ষণভার, নীচজাতীয় শম্বুকের তপশ্চর্য্যা নিবন্ধন রাজ্যে অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ও শম্বুকের শিরশ্ছেদনমানসে রামের পঞ্চবটী আগমন বৃত্তান্ত। বিষ্কম্ভক এই; এবং অঙ্কটি রামখড়্গাঘাতে শাপবিমুক্ত দিব্যপুরুষ শম্বুকের সহিত রামের কথোপকথনে পঞ্চবটী বর্ণনাদি।

সম্মুখে দণ্ডকারণ্য। কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভীষণ রুক্ষদৃশ্য, স্থানে স্থানে নিরন্তর নির্ঝর-ঝরঝর-মুখরিত; কোথাও তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী, কোথাও ঘন বন। ঐ যে জনস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ দক্ষিণারণ্য চলিয়াছে। এই অরণ্যভূমি চিরদিন সর্ব্বলোকলোমহর্ষণ—এখানকার গিরিগহ্বরসকল উন্মত্ত প্রচণ্ড শ্বাপদসঙ্কুল। কোথাও একেবারে নিষ্কুজস্তিমিত, কোথাও নিরন্তর গর্জ্জনধ্বনিত, কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীরগর্জ্জনকারী ভুজঙ্গগণের নিশ্বাসে জ্বালিত অগ্নি, কোথাও গর্ত্তমধ্যে অল্প জল দেখা যাইতেছে, এবং তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের স্বেদবিন্দু পান করিতেছে।—রামের সেই সকল পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে, সীতা তাঁহার সহিত এই বনে বনে থাকিতে কত ভালবাসিতেন এবং সীতাসান্নিধ্যে তাঁহার সকল দুঃখ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত।

তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।

এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভীর! মদকল

ময়ূরের কণ্ঠসদৃশ কোমলচ্ছবি পর্ব্বতে অবকীর্ণ, ঘনস্নিবিষ্ট নীলপ্রধান তরুণ তরুসমূহে শোভিত এবং অনাকুল বিবিধ মৃগযূথে পরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীসকল বহুস্রোতে বহিতেছে; মদমত্ত বিহঙ্গগণের অধিষ্ঠানে বৃন্তচ্যুত বেতস-কুসুম পতিত হইয়া সেই জলকে স্নিগ্ধ ও সুরভিত করিতেছে, এবং পরিপক্ক ফলময় শ্যামজম্বুবনান্তে স্রোত স্খলিত হইয়া মুখরিত হইতেছে। গুহাবাসী ভল্লুকগণের থুৎকারনিঃসরণ-সহিত শব্দ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া অত্যন্ত গম্ভীর বোধ হইতেছে, এবং গজভগ্ন শল্লকীবৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থিসকল হইতে শিশিরকটুকষায় গন্ধ বাহিব হইতেছে।—এই পঞ্চবটী বনে সীতার সহিত বিশ্রম্ভালাপে কতদিন কাটিয়াছে। সেই সকল কথা মনে হইয়া রামের রুদ্ধশোকপ্রবাহ উথলিয়া উঠিতেছে—শরীরপ্রবিষ্ট তীব্র বিষরস যেমন বহুদিন পরে সহসা আপন বেগ প্রকাশ করে।

> চিরাদ্বেগারম্ভী প্রসৃত ইব তীব্রো বিষরসঃ
> কুতশ্চিৎ সংবেগাচ্চলিত ইব শল্যস্য শকলঃ।
> ব্রণো রূঢগ্রন্থিঃ স্ফুটিত ইব হৃন্মর্ম্মণি পুন-
> র্ঘনীভূতঃ শোকো বিকলয়তি মাং নূতন ইব॥

অগস্ত্যাশ্রমে আমন্ত্রিত হইয়া রামকে এই পঞ্চবটী অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। পথে

> গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক-
> স্তম্বাডম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ।

[illegible] প্রচলাকিনাং প্রচলভায়ুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈ-
[illegible] পুরাণরোহিণ স্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ।

এই ক্রৌঞ্চাবত গিরি। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটীর-বাসী পেচককুলের ঘূৎকারবৎ বায়ুপ্রবিষ্ট বংশগুচ্ছের শব্দে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দ, এবং চঞ্চল ময়ূরগণের কেকারবে ভীত হইয়া সর্পেরা প্রাচীন বটের স্কন্ধদেশে লুক্কায়িত।

অদূরে

এতে তে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালঙ্কৃতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ-
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ॥

এই সকল দক্ষিণ পর্ব্বত। পর্ব্বতের কুহরে গোদাবরীর বারিরাশি গদ্গদনিনাদ করিতেছে; নীল শিখরদেশ মেঘালঙ্কৃত, এবং অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুল চঞ্চল তরঙ্গকোলাহলে দুর্দ্ধর্ষ গভীরবারি নদীগণের পুণ্য সঙ্গম দেখা যায়।

এই পঞ্চবটীপ্রবেশ নামক অঙ্কের পরেই সেই ছায়াঙ্ক। মনোহর ক্ষুদ্র কিষ্কন্তকে কলকলভাষিণী তমসা ও মুরলা আসিয়া মিলিয়াছে—এবং বিরহক্ষীণ "অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ" রামচন্দ্রের—চতুর্দ্দিকে বধূসহবাসবিস্রম্ভের স্মৃতিদংশনে—ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কা করিয়া গোদাবরীর নিকটে শীতল জলকণাসম্পৃক্ত বায়ুহিল্লোল প্রার্থনা করিতেছে। ভগবতী ভাগীরথীর অনুগ্রহে সীতা ছায়ারূপিণী—স্পর্শ আছে,

কিন্তু দর্শনের অতীত ; ঠিক্ ছায়ার মত নয়, যেন বাতাসের মত—স্পর্শে তেমনি সঞ্জীবনী এবং বাতাসেরই মত নয়নের অতীত। কিন্তু বাতাসের মত কেবলি একটা উন্মত্ত হাহা-কার নহে—যখন নর্ম্মদাহ্রদ হইতে উঠিয়া আসেন, পরিপাণ্ডু-দুর্ব্বলকপোলসুন্দর বিলোলকবরী মুখখানি—দেখিয়া মনে হয় যেন করুণার মূর্ত্তি অথবা শরীরিণী বিরহব্যথা সমুপস্থিত।

উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কটিই এই করুণাবিগলিত বেদনা দিয়া রচিত। একদিকে পূর্ব্বস্মৃতি সীতাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে—কবে কোন্ করিশাবককে তিনি শল্লকীপত্র খাওয়াইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন, তাহার বিপদ্ হইয়াছে শুনিয়া তাড়াতাড়ি আর্য্যপুত্রকে আহ্বান করিয়া বসেন এবং পরক্ষণেই দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধান স্মরণ করিয়া একেবারে যেন ধূলিসাৎ হইয়া যান ; অন্যদিকে রামও সেই পঞ্চবটীর তরু লতা, মৃগ মৃগী, ময়ূর ময়ূরী, সর্ব্বত্র সীতার স্নেহ অনুভব করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং সীতা সীতা করিতে করিতে মোহপ্রাপ্ত হয়েন।

তখন সীতার স্পর্শ ভিন্ন কিছুই আর তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিতে পারে না। সেই ছায়ারূপিণীর সঞ্জীবন-স্পর্শে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদিত হইয়া আনন্দে একটা অবশ অলস বিহ্বলতা জন্মে। সেই ছায়াহস্তকে তিনি চাপিয়া ধরেন—করে করস্পর্শে উভয়েরই অঙ্গে অঙ্গে যেন পুলক সঞ্চারিত হইয়া উঠে—কিন্তু ধরিয়া রাখা যায় না, অঙ্গ শিথিল

[illegible] ত ছাড়িয়া যায়। যেন সকল হইতে আসিয়া [illegible] চ্যুত হইয়া পড়ে।

[illegible] াদিত হইলেও জীবন অত্যন্ত দুর্ব্বহ। একে সেই পঞ্চবটী বন—এইখানে বসিয়া সীতা, মৃগদম্পতিকে তৃণভক্ষণ করাইতেন, ঐ তাঁহার স্বহস্তরোপিত কদম্বতরু, সম্মুখে সেই উন্নাসচঞ্চলা ময়ূরবধূ—চতুর্দ্দিক সীতাময়; তাহার উপর বাসন্তীর সেই মর্ম্মবেধী বজ্রকঠিন বিদ্রূপাচরণ। মহারাজ, অঙ্গের অমৃত, নয়নের কৌমুদী, দ্বিতীয় হৃদয় বল্লিয়া যাহাকে ভুলাইতে, লোকাপবাদ মিথ্যা জানিয়াও তাহাকে বিসর্জ্জন দিলে কোন্ হৃদয়ে? প্রেয়সী প্রভৃতি শুধু কথার কথা, যশই তোমাদের একমাত্র প্রিয়। রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহাই বা হয় কৈ?

> দলতি হৃদয়ং গাঢোদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
> বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
> জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
> প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥

এ শুধু অনন্ত দহন, ভস্মসাৎ করে না, জ্বালা দেয় মাত্র, শুধু মর্ম্মচ্ছেদ করিতে থাকে, জীবন শেষ করিয়া দেয় না।

হা জানকি! হা চণ্ডি! চতুর্দ্দিকেই তোমাকে দেখিতেছি—তবু তুমি নির্দ্দয় হইয়া আছ কেন? হৃদয় স্ফুটিত হইতেছে, দেহবন্ধ শিথিল হইয়া আসিতেছে, জগৎ শূন্য, অন্তরে নিরন্তর জ্বালা, মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিতেছে,

আমি অতি মন্দভাগ্য! বলিতে বলিতে রা[illegible] পড়িলেন। সীতা তাঁহার ললাট স্পর্শ [illegible] সঞ্চার হইল। সেই স্পর্শ অন্তরে বাহিরে অ[illegible] চেতনা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আনন্দও যেন [illegible] করে।

ভবভূতির হৃদয় এই অশরীরী স্পর্শটুকু—এই আনন্দেও বেদনা, চৈতন্যেও মোহ, এই আবেগ, আকুলতা, মায়া, রহস্য। বাসন্তী তমসা সীতা রাম পঞ্চবটী সমস্ত মিলিয়া যে একটি নিবিড় মায়ারহস্য রচনা করিয়াছে তাহা শুধু এই বেদনাবিদ্ধ কবিহৃদয়ের বহিরুচ্ছ্বাস। সৃষ্টি যেমন মায়াও বটে, সত্যও বটে, ইহাও সেইরূপ। এই ছায়াঙ্ক সম্বন্ধে বোধ করি বলা খাটে "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু।"

এই স্বপ্ন মায়া মতিভ্রম উত্তরচরিতের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্মীকি-আশ্রমে কৌশল্যা-জনকাদি সমাগমেই কি, লব-চন্দ্রকেতুর সুবর্ণিত সৌজন্যপরিপূর্ণ যুদ্ধদৃশ্যেই কি, এবং সপ্তম অঙ্কের নাট্যাভিনয়েই বা কি, সর্ব্বত্রই যেন একটা কি ধরি-ধরি-ধরা-যায়-না, যেন কাহাকে জানি না অথচ জানি, যেন অভিনয় কি সত্য, ভ্রম কি বাস্তব ঠাহরাইয়া উঠা কঠিন। সেইজন্য সুখের মধ্যেও বেদনা, জ্ঞানেও সংশয়। এবং যখন সেই রসাতলোদ্ভূত সিংহাসনে গঙ্গা ও ধরিত্রীর মধ্যস্থলে দেবী সীতা আবির্ভূতা হইলেন তখন সকলে নিশ্চল স্তিমিত—সত্য না মায়া। সেই কুশলবের মুখে "হা তাত

হা অম্ব হা মাতামহ," সেই রামের স্নেহার্দ্র সহর্ষ আলিঙ্গন, সেই অরুন্ধতী সীতা গঙ্গা পৃথিবী বাল্মীকি কুশ-লব প্রজাপুঞ্জ, স্নেহ প্রেম ভক্তি বিস্ময় সুখ দুঃখ মোহ চৈতন্যের অনির্ব্বচনীয় মহাসঙ্গম—সত্য কি মায়া।

---

# মৃচ্ছকটিক।

মৃচ্ছকটিক প্রাচীন উজ্জয়িনীর একখানি উজ্জ্বল সমাজ-চিত্র। ইহাতে তপোবন নাই, ঋষ্যাশ্রম নাই, মানবহৃদয়ের চতুষ্পার্শ্বে বহিঃপ্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসে নাই, কেবল উজ্জয়িনীর রাজশ্যালক, সার্থবাহ, গণিকাকন্যা, ধর্ম্মাধিকরণ, বিলাসভবন ও বৌদ্ধ বিহার দিয়া তদানীন্তন সমাজের কতকগুলি সুন্দর চিত্র রচিত হইয়াছে এবং একটি প্রণয়কাহিনীসূত্রে এই সমস্ত চিত্রগুলি পত্রে পত্রে সুশোভনরূপে গ্রথিত হইয়া মধ্যযুগের সংস্কৃত সভ্যতার একটি অখণ্ড আদর্শ গঠিত করিয়া তুলিয়াছে।

উজ্জয়িনী তখন ভারতবর্ষের মধ্যে মহা সমৃদ্ধিশালী নগরী। প্রশস্ত রাজপথের দুই পার্শ্বে সুসজ্জিত পণ্যবীথিকা, শ্রেণীবদ্ধ সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী ও নিত্য উৎসবময় বিলাসভবন;

নগরপ্রান্তে অহরহ সঙ্গীতধ্বনিত প্রমোদকাননশ্রেণী, পাদমূল ধৌত করিয়া চঞ্চলা শিপ্রা কলস্বরে বহিয়া গিয়াছে। অদূরে বৌদ্ধ বিহার—পরিব্রাজকেরা সেখানে বসিয়া বৌদ্ধ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং নগরীমধ্যে মহাকালমন্দিরে মহা সমারোহে প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগের শিবপূজা সম্পন্ন হয়।

এই চির-উৎসবময়ী উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠিচত্বরে দ্বিজসার্থবাহ চারুদত্তের বাস; এবং গণিকাকন্যা বসন্তসেনা এই নষ্টবিত্ত সম্ভ্রান্ত পৌরজনের গুণমুগ্ধা প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। কিন্তু যাহার রূপ ও যৌবন দুই আছে মকরকেতন তাহার প্রণয়পথ কখনও নিষ্কণ্টক করেন না। বসন্তসেনার রূপযৌবন নষ্টচরিত্র রাজশ্যালকের শরীর মন নিরন্তর মদনানলে দগ্ধ করে। কিন্তু বসন্তসেনা গণিকাকন্যা হইলেও গণিকার মত তাঁহার স্বভাব নহে সুতরাং শকারের ঐশ্বর্য্যপ্রভাব তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তিনি চারুদত্তের গুণাবলী শুনিয়া অবধি মনে মনে তৎপ্রতি অনুরাগবতী হইয়াছেন, এবং যে দিন কামদেবায়তনোদ্যানে চারুদত্তের দর্শন লাভ করিলেন, সে দিন হইতে সেই সৌম্যমূর্ত্তি ভিন্ন তাঁহার অন্তরে আর কিছুই স্থান পায় নাই।

কিন্তু নীচবংশ শকারের ইহা সহ্য হইবে কেন? সে ভগিনীপতির অনুগ্রহপরিপুষ্ট হইয়া কেবলমাত্র অষ্টাদশ ব্যসন আরম্ভ করিয়াছে; এবং উজ্জয়িনীতে নিশাচর দুর্জ্জন-

দ্বিগের অগ্রণী বলিয়াই তাহার খ্যাতি। সন্ধ্যার পর তাহার ভয়ে যুবতীজনের একাকিনী পথে বাহির হইবার যো ছিল না। বসন্তসেনাকে একবার সুবিধামত পাইলে শকার কি সহজে ছাড়ে?

দৈবক্রমে কামদেবায়তন উদ্যান হইতে বসন্তোৎসব দেখিয়া ফিরিতে বসন্তসেনার সে দিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। তখন শকার সদলবলে পথে বাহির হইয়াছে এবং পথ প্রায় জনশূন্য। সেই নির্জ্জন পথে একাকিনী পাইয়া শকার, বিট ও চেটের সহিত, বসন্তসেনার অনুগমন করিল। এবং নানাবিধ সম্বোধনে বসন্তসেনাকে দ্রুতগতি হইতে নিরস্ত হইবার জন্ম বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। বিট সাধু-ভাষায় বসন্তসেনার নৃত্যপ্রয়োগবিশদ চরণযুগলের প্রশংসা করিয়া ও ব্যাধানুসারচকিতা হরিণীর সহিত উপমা খাটাইয়া কথাগুলি একটু সাজাইয়া গুছাইয়া বলে। এবং শকার অত্যন্ত কুৎসিৎ গ্রাম্য ভাষায় আপন দারুণ অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত করিতে থাকে, এবং কখনও "রামভয়ে পলায়মানা দ্রৌপদীর" সহিত, কখনও বা "রাবণের কুন্তীর" সহিত তুলনা করিয়া বসন্তসেনাকে স্বীয় শয্যাসঙ্গিনী করিবার আশ্বাস দেয়। কিন্তু বসন্তসেনার গতিবেগ যখন কিছুতেই মন্দীভূত হইল না, তখন আশ্বাসবচনের পরিবর্ত্তে অজস্র কটুকাটব্য বর্ষিত হইতে লাগিল এবং শকার একবার তাঁহার কেশগুচ্ছ ধারণ করিলে ভীমসেন, জমদগ্নিপুত্র, কুন্তীসুত প্রভৃতির

বলবীর্য্যও যে ব্যর্থ হইবে বারবার করিয়া এ কথা বসন্ত-সেনার কর্ণগোচর করা হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে বসন্তসেনা অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া একেবারে চারুদত্তের পক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চারুদত্তের জপসমাপ্তি হইয়াছে এবং বয়স্য মৈত্রেয় পরিচারিকা রদনিকা সমভিব্যাহারে মাতৃকাগণের পূজার্থে পক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিতেছেন। দ্বার উন্মুক্ত হইতেই বসন্তসেনা তাড়াতাড়ি রদনিকার হস্তস্থিত দীপ নিবাইয়া দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাতাসে দীপ নিবিয়া গেল ভাবিয়া মৈত্রেয় পুনবার দীপ জ্বালিয়া আনিতে গেলেন। ইতিমধ্যে শকার আসিয়া বসন্তসেনাভ্রমে রদনিকার কেশগুচ্ছ ধারণ করিল। মৈত্রেয় প্রদীপ লইয়া আসিতেই শকার রদনিকাকে ছাড়িয়া দিল। বিট মাস্কনা ভিক্ষাপূর্ব্বক এ ঘটনা যাহাতে চারুদত্তের কর্ণগোচর না হয় সে জন্য মৈত্রেয়কে বিস্তর অনুনয় সহকারে অনুরোধ করিল। কিন্তু শকারের আস্ফালন থামিল না। সে শাসাইয়া গেল যে, বসন্তসেনা আমাদের অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব সেই গণিকাকন্যাকে প্রত্যর্পণ না করিলে কপাটতলপ্রবিষ্ট কপিত্থবৎ মডমডশব্দে চারুদত্তের মস্তক চূর্ণীকৃত হইবে জানিয়ো।

বাহিরে যখন এই কাণ্ড চলিয়াছে, গৃহাভ্যন্তরে তখন

চারুদত্ত বসন্তসেনাকে রদনিকা ভাবিয়া পুত্র রোহসেনকে গৃহাভ্যন্তরে আনিতে আদেশ করিলেন এবং বসন্তসেনার প্রতি স্বীয় জাতীকুসুমবাসিত উত্তরীয়খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা রোহসেনের গাত্রাচ্ছাদন করিয়া দিতে বলিলেন। বসন্তসেনা নীরব নিশ্চল। আদেশ পালিত হইল না দেখিয়া চারুদত্ত ক্ষুণ্ণহৃদয়ে বলিলেন, হায় রদনিকে, আজ প্রতিবচন পর্য্যন্ত নাই—পুরুষের অবস্থাবিপর্য্যয়ে মিত্রও শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, চিরানুরক্তও বিরক্ত হয়।

কথা শেষ হইতে না হইতে রদনিকাকে লইয়া মৈত্রেয় প্রবেশ করিলেন। চারুদত্ত দেখিলেন যে, যাহার অঙ্গে উত্তরীয় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সে রদনিকা নহে, কিন্তু যেই হোক্, ইহার অঙ্গে উত্তরীয় বড় শোভা পাইয়াছে।

ছাদিতা শরদভ্রো চন্দ্রলেখেব দৃশ্যতে।

মৈত্রেয় বসন্তসেনার পরিচয় দিয়া দিলেন। এবং কামদেবায়তনের কাহিনী ও রাজশ্যালকের দুর্ব্ব্যবহারের কথাও প্রকাশ করিয়া বলিতে ত্রুটি করিলেন না। চারুদত্ত কেবল বলিলেন "অজ্ঝোংহসো" এবং উত্তরীয়নিক্ষেপের জন্য বসন্তসেনার নিকট অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বসন্তসেনাও চারুদত্তের ন্যায় সম্ভ্রান্ত জনের গৃহে তাঁহার প্রবেশ অত্যন্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা চাহিলেন। ইহাই প্রথম সূচনা। তাহার পর রাজপথে বিপদাশঙ্কায় বসন্তসেনা অলঙ্কারগুলি চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত

রাখিলেন। এবং পরিশেষে চারুদত্তই তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া আসিলেন।

এইখানে মৃচ্ছকটিকের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইল। এবং এই যে চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনার সংস্পর্শ সূচিত হইল, দশ অঙ্কের মধ্য দিয়া বিবিধ বিপ্লবচক্রে ও বিচিত্র চিত্রে ইহাই ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা-কবি শূদ্রক গণিকা-কন্যার এই প্রণয়বন্ধনে উজ্জয়িনীর সাময়িক সমাজনাট্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এবং অঙ্কে অঙ্কে এই প্রণয়ঘটনার চতুর্দ্দিকে বিলাসী উজ্জয়িনীর সমগ্র বিলাস অনুলিপ্ত হইয়াছে।

গণিকা তখন নগরের শোভা' বলিয়া গণ্য হইত এবং দ্যূতভবন তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক ছিল। এবং এই দুই বিলাসের অনুগ্রহে উজ্জয়িনীতে চোরেরও অসদ্ভাব ছিল না। রজনীতে রাজপথে নগরের রক্ষকেরা যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত, গৃহস্থের প্রাচীরের ছিদ্রপথে সেইরূপ বহু-সংখ্যক সুদক্ষ চোরেরও গতিবিধি ছিল। এবং বসন্তসেনার অলঙ্কারন্যাসের পর দরিদ্র চারুদত্তের ভবনেও চুরি হইল। চোর বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলির একখানিও রাখিয়া গেল না, কেবল প্রাচীরগাত্রে বহুযত্নরচিত একটি দর্শনীয় ছিদ্রপথ রাখিয়া গেল যে, প্রভাতে উঠিয়া চারুদত্ত ও প্রতিবেশীবর্গ চোরকে কেবলমাত্র গালি না দিয়া তাহার শিল্পনৈপুণ্যেরও প্রশংসা করিবার অবসর পান।

এই ঘটনায় চারুদত্তকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া মৈত্রেয় পরামর্শ দিলেন, সখে, যখন সাক্ষী কেহ নাই তখন এই ন্যাস্ত ধনের কথা অস্বীকার করিলেই চলিবে—তুমি অধিক চিন্তা ভাবিত হইয়ো না। কিন্তু চারুদত্ত মিথ্যা বলিবার পাত্র নহেন; তিনি ভিক্ষা করিয়াও বসন্তসেনার গচ্ছিত ধন প্রতিদান করিবেন, তথাপি চরিত্রভ্রংশকারণ মিথ্যার শরণাপন্ন হইবেন না।—পত্নী ধূতা এই সংবাদ শ্রবণে অচিরে মৈত্রেয়কে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এবং চারুদত্ত পাছে স্ত্রীর ধন লইতে কুণ্ঠিত হয়েন, রত্নষষ্ঠী ব্রত উদ্‌যাপনচ্ছলে ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়কে রত্নমালা দান করিয়া স্বামীর সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।

চারুদত্তের আদেশে মৈত্রেয়ই বসন্তসেনা সমীপে সেই রত্নমালা লইয়া গেলেন। বসন্তসেনার প্রকাণ্ড আটমহল পুরী। পথের সম্মুখেই গগন স্পর্শ করিয়া দন্তিদন্তনির্ম্মিত তোরণ উঠিয়াছে এবং বিচিত্র পতাকাবলী নিয়ত বায়ুবশে সঞ্চালিত হইয়া তোরণস্তম্ভসমূহের শোভা সম্পাদন করিতেছে। নিম্নে সুনির্ম্মিত প্রস্তরবেদিকার উপরে চূতপল্লবরম্য স্ফাটিক মঙ্গলকলসসমূহ সুসজ্জিত, এবং দুর্ভেদ্য কনক-কপাট দারিদ্র্যকে সেই বিলাসপুরী হইতে নিয়ত দূরে রক্ষা করে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিবিধরত্নপ্রতিবদ্ধ কাঞ্চনসোপানশোভিত শুভ্র প্রাসাদশ্রেণী দর্শকের নয়ন ঝলসিয়া দেয়। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে গো-মহিষ-অশ্বশালা। শত শত পরিচারক দিবারাত্রি এই সকল হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ জীবগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত।

[illegible] প্রকোষ্ঠে কুলপুত্রগণের উপবেশন নিমিত্ত বহুবিধ [illegible], কোথাও মণিময় গুটিকাযুক্ত পাশকপীঠ, কোথাও [illegible]কপীঠোপরি অর্দ্ধপঠিত পুস্তক অনাবৃত পড়িয়া রহি-[illegible] এবং মদনসন্ধিবিগ্রহচতুর গণিকা ও বৃদ্ধ বিটগণ [illegible]র্ণবিলিপ্ত চিত্রফলকহস্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। চতুর্থ প্রকোষ্ঠে নিত্য যুবতিকরতাড়িত গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি, [illegible]বিকৃতমধুর বংশীরব ও কামিনীগণের নূপুরশিঞ্জনসহ [illegible]তালে নৃত্য। কোথাও নাট্যপাঠ হইতেছে, কোথাও গণিকাদারিকাগণ বিবিধ দেহভঙ্গী ব্যক্ত করিতেছে। এবং গবাক্ষে সলিলগর্গরীসকল বাতগ্রহণে শীতল হইতেছে। পঞ্চম প্রকোষ্ঠে হিঙ্গুগন্ধসুরভিত রন্ধনশালা—সেখানে আসিয়া বিবিধ মাংস ও পায়সাদির লোভে মৈত্রেয়ের রসনা সিক্ত হইয়া উঠিল এবং নিমন্ত্রণলাভের দুরাশায় মন চঞ্চল হইতে লাগিল। ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠের তোরণ সুবর্ণনির্ম্মিত এবং গৃহতল নীলমণিপরিশোভিত। উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ বৈদূর্য্য মৌক্তিক প্রবালক পুষ্পরাগ ইন্দ্রনীল পদ্মরাগ মরকত প্রভৃতি রত্নরাশি লইয়া পরীক্ষা ও অলঙ্কারনির্ম্মাণ করিতেছে। কোথাও মদিরাপান চলিয়াছে, দাসীগণ কর্পূরসুবাসিত তাম্বূল বিতরণ করিতেছে এবং হাস্যপরিহাসের বিরাম নাই। সপ্তম প্রকোষ্ঠে পক্ষিশালা। অন্যোন্যচুম্বনরত কপোতমিথুন, সুভাষিণী মদনসারিকা, পরপুষ্টা কোকিলা প্রভৃতি নানা জাতীয় বিহঙ্গকুল এই বিহঙ্গবাটিকায় সুখে নিবদ্ধ। অষ্টম

প্রকোষ্ঠে বসন্তসেনার আত্মীয় স্বজনেরা বাস্ করে। বসন্ত-সেনার মাতাকে দেখিয়া মৈত্রেয় চেটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তৈলচিক্কণ পদযুগল উপানৎ মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চাসনোপবিষ্টা পুষ্পপ্রাবারকপ্রাবৃতা ঐ রমণীটি কে? চেটী উত্তর করিল, ইনিই আমাদের আর্য্যার জননী। মৈত্রেয় আর্য্যার মাতার দৈহিক পরিধি দেখিয়া উপহাসরসিকতার লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। চেটীকে বলিলেন, ইঁহার যেরূপ আয়তন দেখিতেছি, বোধ করি বৃহৎ শিব-লিঙ্গের ন্যায় ইঁহাকে অগ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরে চতুষ্পার্শ্বে এই প্রাচীর ও দ্বারসকল নির্ম্মিত হইয়াছে। চেটী বলিলেন, ঠাকুর, উপহাস করিবেন না, ইনি চাতুর্থিকে অত্যন্ত কাতর আছেন। মৈত্রেয় প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্ চাতুর্থিক, তুমি এই দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানের প্রতি একবার কৃপা কর।

এইরূপে মুগ্ধ মৈত্রেয়ের মুখ দিয়া মৃচ্ছকটিককার বসন্ত-সেনার পুরী বর্ণনা করিয়াছেন। এবং প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে যাইতে বিলাসের এক একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটককারেরা এইরূপ আনুপূর্ব্বিক চিত্রন্যস্ত বর্ণনা করিতে যেন কিছু ভালবাসেন। কালিদাসের শকুন্তলাও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলি চিত্রাঙ্কিত—এমন কি, ছোটখাট উপমাগুলিও এক একটি সুন্দর চিত্রে উদ্ভাসিত। মৃচ্ছকটিকও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে এইরূপ একটি চিত্রপরম্পরা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তবে কালিদাসের

নাটকের মত ইহাতে কেবলি সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সমাবেশ নহে। বাস্তব জগতের দুই চারিটা নাতিসুন্দর স্থূল দৃশ্যও ইহাতে আছে। কালিদাস বসন্তসেনার আলয়ে প্রবেশ করিলে তদীয়া স্থূলাঙ্গী জননীটিকে মৈত্রেয়ের সমক্ষে কিছুতেই বাহির করিতেন না। একেবারে নৃত্যগীত মদিরা উৎসব ও রূপসীগণের অর্দ্ধ-অনাবৃত চারু যৌবনের মধ্য দিয়া মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার বৃক্ষবাটিকায় লইয়া যাইতেন— যেথানে যুবতীগণের সনূপুর পাদতাড়নে অশোকতরু মুকুলিত হইয়া উঠে এবং সেই অশোকশাখা হইতে বিলম্বিত দোলায় বসিয়া মৃদু সান্ধ্যপবনে দূর মৃদঙ্গধ্বনির তালে তালে বসন্ত-সেনা যৌবনের আন্দোলনসুখ অনুভব করেন।

অষ্টম প্রকোষ্ঠের পর এই বৃক্ষবাটিকা। চেটী মৈত্রেয়কে বরাবর সেইখানে লইয়া গেল। বসন্তসেনা সেইখানেই ছিলেন। পরস্পরের কুশলজিজ্ঞাসাদি সমাপনান্তে মৈত্রেয় বলিলেন যে, চারুদত্ত দ্যূতক্রীড়ায় আপনার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি হারাইয়া তৎপরিবর্ত্তে এই রত্নমালা প্রেরণ করিয়াছেন। বসন্তসেনা অলঙ্কারগুলির সন্ধান পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তাঁহারই পরিচারিকা মদনিকার প্রণয়ী শর্ব্বিলক নামক এক ব্রাহ্মণসন্তান প্রণয়িনীকে নিষ্ক্রয়দানে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিতে এই কার্য্য করিয়াছে। এবং এই ঘটনা প্রকাশ হইবার পর মদনিকাকে তিনি শর্ব্বিলকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু মৈত্রেয়কে সে কথা না বলিয়া,

রত্নমালা গ্রহণপূর্ব্বক, প্রদোষে চারুদত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন বলিয়া বিদায় করিলেন।

মৈত্রেয় গিয়া চারুদত্তকে সমস্ত বলিলেন। এবং ঝড়বৃষ্টি-বিদ্যুতের মধ্য দিয়া যথাসময়ে ছাতা মাথায় দিয়া বসন্তসেনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংস্কৃত কবির নিকট বর্ষাবর্ণনা কখনও বাঁক যায় না—বিশেষতঃ যখন এমন একটি প্রণয়-কাহিনীর সুবিধা আছে। মৃচ্ছকটিককার নানা ছন্দে এই মেঘ ঝঞ্ঝা অশনি বর্ণনা করিয়াছেন এবং গুরুগুরু বর্ষাবর্ণনায় একদিকে সোৎকণ্ঠ চারুদত্ত ও অন্যদিকে অভিসারিকা বসন্তসেনার মনে প্রকৃতিকে প্রেমাঢ় করিয়া তুলিয়াছেন। এবং বিদ্যুৎ যখন অম্বরকে ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতে লাগিল, রবি আর থাকিতে পারিলেন না—চারুদত্ত ও বসন্তসেনাকে পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অঙ্ক শেষ করিলেন।

> ধন্যশতমস্তু দুর্দিনমবিরতধারং শতহ্রদা স্ফুরতু।
> অস্মদ্বিধদুর্লভয়া যদহং প্রিয়য়া পরিষ্বক্তঃ ॥

কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইল। চারুদত্ত ভৃত্য বর্দ্ধমানককে শকট ঠিক করিয়া বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে লইয়া যাইতে বলিয়া গিয়াছেন। বসন্তসেনা গাত্রোত্থান করিয়া ধূতা দেবীর সংবাদ লইলেন —

> বস। অবি সম্ভর্গদি চারুদত্তসস পরিজণো।
> চেটী। সম্ভগ্নিদ্‌সদি।

বস। কদা?

চেটী। যদা অজ্জআ গমিস্সদি।

বস। তদো পঢমং সন্তুস্সিদব্বং।*

তদনন্তর তিনি আর্য্যা ধূতার নিকট এই বলিয়া সেই রত্নাবলী পাঠাইয়া দিলেন যে, আমি চারুদত্তের গুণনির্জ্জিতা দাসা, আপনারও দাসী, অতএব এই রত্নাবলী যোগ্য কণ্ঠে ন্যস্ত হউক্।

ধূতা বলিয়া পাঠাইলেন—তাহাও কি হয়? আর্য্যপুত্র প্রসন্ন মনে যাহা আপনাকে দান করিয়াছেন তাহা আমি লইব কেন? আর্য্যপুত্রই আমার একমাত্র আভরণ।

এমন সময় রদনিকা রোহসেনকে লইয়া প্রবেশ করিল। রোহসেন মৃৎশকটিকার পরিবর্ত্তে স্বর্ণশকটিকা লইয়া খেলা করিতে চায়। দাসা তাহাকে বুঝাইতেছে যে, তোমার পিতার আবার ধন হউক্, সকলি হইবে। বসন্তসেনা চারুদত্তের পুত্রকে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইলেন। এবং বালক স্বর্ণশকটিকার জন্য কাঁদিতেছে শুনিয়া স্বীয় অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিলেন—ইহার দ্বারা তুমি স্বর্ণশকটিকা প্রস্তুত করাইয়া লইও।

---

* বস। চারুদত্তের পরিজন কি সন্তুষ্ট হইতেছেন?
চেটী। সন্তুষ্ট হইবেন।
বস। কখন?
চেটী। যখন আর্য্যা চলিয়া যাইবেন।
বস। তবে আমাকেই প্রথম সন্তুষ্ট হইতে হইবে।

শূদ্রক বসন্তসেনাকে বরাবরই নারীহৃদয়ের এই স্বাভাবিক সৌকুমার্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন। এ স্নেহ গণিকা-সুলভ নহে—নারীহৃদয়ের অতি গভীর তল হইতে ইহা উৎসারিত। রোহসেনকে দেখিয়াই চারুদত্তগতপ্রাণার হৃদয়ে মাতৃস্তনে ক্ষীরসঞ্চারের ন্যায় এই অনির্ব্বচনীয় বাৎসল্য সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রিয়জনের পরিজনবর্গকেও প্রেম এমনি আপনার করিয়া তোলে।

কিন্তু শকট সুসজ্জিত। আর বিলম্ব করা চলে না। বর্দ্ধমানক চেটীকে দিয়া সংবাদ পাঠাইল যে, বসন্তসেনার জন্য পক্ষদ্বারে কর্ণীরথ অপেক্ষা করিতেছে। বসন্তসেনা আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন—তখনও তাঁহার প্রসাধন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। বর্দ্ধমানক যানের আচ্ছাদন ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি তাহা ঠিক করিয়া আনিতে গেল। ইতিমধ্যে বসন্তসেনা আসিয়া শকটে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে সে শকট চারুদত্তের নহে, তাহা রাজশ্যালক সংস্থানকের।

চারুদত্তের শকটও শূন্য গেল না। তাহাতে আর্য্যক নামে এক রাজবিদ্রোহী গোপপুত্র উঠিয়া বসিয়াছেন। সে সময়ে রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য উজ্জয়িনীতে এক চক্রান্ত চলিয়াছিল। লোকমুখে একটা ভবিষ্যদ্বাণী রটনা হইয়াছিল যে, উজ্জয়িনীরাজ পালককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে আর্য্যক নামে এক গোপপুত্র অভিষিক্ত হইবেন। এই

ভবিষ্যদ্বাণী রটনার ফলে অসন্তুষ্ট প্রজাবর্গের অনেকেই গোপনে আর্য্যকের দলভুক্ত হইয়াছিল। শকট যখন পুষ্প-করণ্ডকে আসিয়া পঁহুছিল, চারুদত্ত বসন্তসেনাকে নামাইয়া লইতে আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন।

করিকরসমবাহুঃ সিংহপীনোন্নতাংসঃ
পৃথুতরসমবক্ষাস্তাম্রলোলায়তাক্ষঃ।
কথমিদমসমানং প্রাপ্ত এবংবিধো যো
বহতি নিগড়মেকং পাদলগ্নং মহাত্মা॥ *

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ততঃ কো ভবান্?"—আর্য্যক স্বীয় পরিচয় দিলেন। চারুদত্ত বলিলেন,

বিধিনৈবোপনীতস্ত্বং চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
অপি প্রাণানহং জহ্যাং নতু ত্বাং শরণাগতম্। †

এবং তাঁহার নিগড় অপনীত করাইয়া দিয়া তাঁহাকে সেই শকটেই রাজপুরুষদিগের দৃষ্টির বাহিরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন।

এদিকে বসন্তসেনা পড়িলেন শকারের হাতে। সে প্রথমে প্রবহণমধ্যে উঁকি মারিয়াই স্থির করিল, গাড়ীতে

---

* করিকরসমবাহু, সিংহপীনোন্নতাংস, বিশালবক্ষ, তাম্রলোলায়তচক্ষু, এই সকল মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্ত হইয়াও ইনি পাদলগ্ন নিগড় বহন করিতেছেন কেন?

† আপনি দৈবকর্ত্তৃকই এখানে উপনীত হইয়া আমার চক্ষুগোচর হইলেন। প্রাণও যদি ত্যাগ করিতে হয়, শরণাগত আপনাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

চড়িয়া নিশ্চয় কোন রাক্ষসী আসিয়াছে। বিট গিয়া দেখিল, বসন্তসেনা। বসন্তসেনা বিটের শরণাপন্ন হইলেন। বিট তাঁহার কথা প্রকাশ করিল না। বরঞ্চ যাহাতে শকার প্রবহণ ছাড়িয়া পলায়ন করে তৎপক্ষে চেষ্টা করিল। কিন্তু রাজশ্যালক গাড়ী ছাড়িয়া পদব্রজে যাইতে রাজি হয় না। তখন অগত্যা বসন্তসেনার কথা প্রকাশ হইল। শকার একেবারে তাঁহার চরণে পড়িয়া আরম্ভ করিল,

এশে পড়েমি চলণেশু বিশালণেত্তে
হথঞ্জলিং দশণহে তব শুদ্ধদন্তি।
জং তং মএ অবকিদং মদণাতুলেণ
তং খম্মিদাশি বলগত্তি তব ক্মি দাশে॥ *

কিন্তু বসন্তসেনা আহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তখন শকার ক্রুদ্ধ হইয়া বিটকে বলিল, এই স্ত্রীলোকটাকে মারিয়া ফেল। বিট সম্মত হইল না। বলিল যে, নগরের শোভা কুলকামিনীসদৃশী প্রণয়বতী এই তরুণী নিরপরাধাকে হত্যা করিয়া পরলোকনদী উত্তীর্ণ হইব কিরূপে?

শকার উত্তর করিল, আমি ভেলার ব্যবস্থা করিব। এখানে হত্যা করিলে কে দেখিবে?

---

* হে বিশালনেত্রে, তোমার চরণে পতিত হইতেছি, হে দশনখে, শুদ্ধদন্তি, তোমার নিকট হস্তাঞ্জলি করিতেছি। মদনাতুর আমা কর্ত্তৃক তুমি যে অপকৃত হইয়াছিলে তাহা ক্ষমা করিয়াছ—হে বরগাত্রি, আমি তোমার দাস।

বিট বলিল, দেখিবে অনেকে,

> পশ্যন্তি মাং দশদিশো বনদেবতাশ্চ
> চন্দ্রশ্চ দীপ্তকিরণশ্চ দিবাকরোঽয়ম্।
> ধর্ম্মানিলৌ চ গগনঞ্চ তথান্তরাত্মা
> ভূমিস্তথা সুকৃতদুষ্কৃতসাক্ষিভূতা॥ *

শকার বলিল, তবে বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া হত্যা কর—কেহ দেখিতে পাইবে না।

বিট আর থাকিতে পারিল না—"মূর্খ অপধ্বস্তোঽসি" বলিয়া গালি দিয়া বসিল।

তখন শকার চেটকে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদনার্থে আদেশ করিল। সেও প্রভুবাক্য পালন করিতে অসম্মত হইল।

শকার বলিল, তবে আমি স্বহস্তেই ইহাকে বিনাশ করি।

বিট তাহাতে বাধা দিল। বলিল, খবরদার, আমাদের সম্মুখে স্ত্রীহত্যা করিয়া তুমি কখনও নিষ্কৃতি পাইবে না।

বিপদ দেখিয়া শকার পুনরায় মদনশরাহতের ন্যায় বসন্তসেনাকে "বাসু বাসু" সম্বোধন করিতে লাগিল। বিট ও চেট এই ভাব দেখিয়া প্রস্থান করিল। এবং তখন শকার নির্ভয়ে বসন্তসেনার গলা টিপিয়া ধরিল। চারুদত্তের নাম গ্রহণ করিতে করিতে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মৃতা ভাবিয়া শকার তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। এবং

---

* আমাকে দেখিতেছেন, দশদিক্, বনদেবতাসকল, চন্দ্র, দিবাকর, ধর্ম্ম, অনিল, গগন, অন্তরাত্মা এবং সুকৃতদুষ্কৃতসাক্ষিভূতা ভূমি।

ধর্ম্মাধিকরণে গিয়া চারুদত্তের নামে এই হত্যাভিযোগ উপস্থিত করিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রেষ্ঠিকায়স্থসহ অধিকরণিক বিচার করিতে বসিলেন। অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণাদি গৃহীত হইল। বসন্তসেনার মাতা আসিয়াও রাজশ্যালকের কথার অনুকূলে সাক্ষ্য দিল। বিস্তর বিচারবিতর্কের পর অধিকরণিক চারুদত্তকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ বাহির হইল।

এদিকে বসন্তসেনাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পতিত দেখিয়া একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু নিকটস্থ বিহারে লইয়া গিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।—বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জয়িনীতে তখনও প্রবল ছিল বলিয়া বোধ হয়। এবং তদানীন্তন নাটকাদিতে শিবের নামে নান্দী থাকিলেও বৌদ্ধদিগের প্রতি বিশেষ একটু সহানুভূতি দৃষ্ট হয়।—আমাদের ভিক্ষু বসন্তসেনাকে দেখিয়াই চিনিয়াছেন—ইনিও বুদ্ধেরই একজন শরণাগতা। ভিক্ষুটিও বসন্তসেনার পরিচিত—নাম সংবাহক। বসন্তসেনা এক সময়ে ইহাঁকে স্বীয় বলয় বিক্রয় করিয়া দ্যূতাধ্যক্ষের ঋণ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এখন এই ভিক্ষুর সেবা-শুশ্রূষায় তিনি মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধৃত হইলেন।

এইরূপে কখনও পারিবারিক শান্তির চিত্র, কখনও গণিকালয়, কখনও দ্যূতশালা, কখনও সন্ধিচ্ছেদ, কখনও ধর্ম্মাধিকরণ, কখনও বৌদ্ধ বিহার, কখনও শ্রমণক, কখনও

বা রাজশ্যালক, নানা চিত্রের মধ্য দিয়া মৃচ্ছকটিকের আখ্যায়িকা অগ্রসর হইয়াছে। সকল চিত্রগুলি চিত্ররূপে পরিস্ফুট করিয়া দেখান আমাদের এ স্বল্প স্থানে অসম্ভব। তৃতীয় অঙ্কে সামান্ত চৌর্য্যঘটনা লইয়াই মৃচ্ছকটিককার কতগুলি চিত্র দিয়াছেন! দ্বিতীয় অঙ্কে সংবাহক ও মাথুরেব দ্যূতদ্বন্দ্বে দ্যূতশালার কত চিত্র আছে! এমন প্রতি অঙ্কে উজ্জয়িনী-সমাজের ছোট বড় চিত্র কি যে না বর্ণিত হইয়াছে বলা কঠিন। এবং এই সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রচিত্রাবলী দশম অঙ্কে বধ্যভূমিতে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। সেখানে চণ্ডালেরা চারুদত্তকে শূলে দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সহসা কোথা হইতে জীবিতা বসন্তসেনা আসিয়া তাঁহাব প্রাণদণ্ড রহিত করিলেন। দুন্দুভিরবে চতুর্দ্দিকে পুরাতন রাজার সিংহাসনচ্যুতি ঘোষিত হইল। আর্য্যক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। শকার চারুদত্তের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। চারুদত্তের অনুরোধে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। রাজাদেশে বসন্তসেনা চারুদত্তের ধর্ম্মপত্নীরূপে গৃহীত হইলেন। ধূতা দেবী তাঁহাকে সাদরে ডাকিয়া লইলেন। সংবাহক সর্ব্ববিহারের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। এবং সর্ব্বত্র শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।—এই বধ্যভূমিতে সমস্ত উজ্জয়িনীসমাগমে মৃচ্ছকটিকের উপযুক্ত উপসংহার।

# জয়দেব।

সকল জিনিষেরই এমন এক একটি কেন্দ্রস্থল আছে যেখান হইতে না দেখিলে তাহাকে কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে ও সমগ্রভাবে দেখা হয় না। এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন একদেশ মাত্র দেখিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মনে তৎসম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা জন্মিয়া থাকে।

ন্যায়শাস্ত্রের একটি উদাহরণে এই তত্ত্বটি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কতকগুলি অন্ধ স্পর্শদ্বারা একবার হস্তীর আকার নির্ণয় করিয়াছিল। যে অন্ধ হস্তীর পাদস্পর্শ করিল, সে হস্তীকে স্তম্ভাকার বলিয়া বর্ণনা করিল। যে শুণ্ড স্পর্শ করিল, সে বলিল, না, এ ত স্তম্ভ নয়, এ যে সর্পাকার দেখিতেছি। যে ব্যক্তি দৈবক্রমে হস্তীর কর্ণ স্পর্শ করিয়াছিল, সে উভয়কেই মিথ্যাবাদী ঠাহরাইয়া হস্তীকে কুলার মত বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল। এইরূপে হস্তীর আকার লইয়া অন্ধে অন্ধে যখন তুমুল কলহ বাধিয়াছে, এক চক্ষুষ্মান্ ব্রাহ্মণ আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, বাপুসকল, তোমরা কেহই মিথ্যা বল নাই, কিন্তু হস্তীর এক এক অঙ্গমাত্র স্পর্শ করিয়া তাহাকে তদনুরূপ বর্ণনা করিয়াছ। তোমাদের সকলের বর্ণনা মিলাইয়া লইলে একটি সমগ্র হস্তীর বর্ণনা করা হয়।

হস্তী সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ যে কথা বলিয়াছিলেন, প্রেম সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। প্রেমের স্বরূপ সমগ্রভাবে না দেখিয়া

অনেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখেন। সেই জন্য কেহ বা বলেন, শারীরিক সম্ভোগেই প্রেমের পর্য্যবসান। কেহ বলেন, ইহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার এবং যোগীজনসুলভ ধ্যানমাত্রাবলম্বী। কেহ বলেন, ইহা ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তিমাত্র। কেহ বলেন, ইহা এক অতীন্দ্রিয় মনোজ ভাব। কিন্তু যে কেন্দ্রভূমি হইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই শরীর মন, সম্ভোগ এবং প্রীতি, আলিঙ্গন এবং ধ্যান একটি সমগ্র সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়, সে কেন্দ্রভূমিতে এই সকল ভিন্নমতাবলম্বী বিরোধীবর্গের কেহই উপনীত হয়েন নাই।

সেখান হইতে যেরূপ প্রতিভাত হয়, একজন ইংরাজ কবি—শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং—"Inclusions" নামক একটি ক্ষুদ্র কবিতায় তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"Oh, wilt thou have my hand, Dear,
to lie along in thine ?
As a little stone in a running stream,
it seems to lie and pine.
Now drop the poor pale hand, Dear,
unfit to plight with thine.

Oh, wilt thou have my cheek, Dear,
drawn closer to thine own ?

My cheek is white, my cheek is worn,
by many a tear run down.
Now leave a little space, Dear,
lest it should wet thine own.

Oh, must thou have my soul, Dear,
commingled with thy soul?
Red grows the cheek, and warm the hand,
the part is in the whole·
Nor hands nor cheeks keep separate,
when soul is joined to soul." *

---

* হে প্রিয়তম, আমার এই হাতখানি কি তোমার ঐ হাতের উপরে ফেলিয়া রাখিতে চাও? এই দেখ, স্রোতের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র উপলখণ্ডের মত আমার এই করতল মুহ্যমানভাবে পড়িয়া আছে, এই ক্ষীণ পাণ্ডুবর্ণ হস্ত তুমি পরিত্যাগ কর প্রিয়তম, এ তোমার সহিত সম্মিলিত হইবার যোগ্য নহে।

হে প্রিয়তম, আমার এই কপোল কি তোমার কপোলের নিকটে আকর্ষণ করিতে চাও? দেখ, আমার বিবর্ণ কপোল অশ্রুজলধারায় ক্ষীয়মান—মধ্যে ব্যবধান রাখিয়া দাও প্রিয়তম, নহিলে, অশ্রুজলে তোমার কপোলও সিক্ত করিয়া দিবে।

হে প্রিয়তম, আমার এই হৃদয় কি তোমার হৃদয়ের সহিত এক করিতে চাও? আমার বিবর্ণ কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল, আমার অসাড় হস্তে জীবনের উত্তাপ সঞ্চারিত হইল। সমগ্রের মধ্যেই অংশ আছে; করতলের সহিত করতল, এবং কপোলের সহিত কপোল বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না, যখন হৃদয়ের সহিত হৃদয় সংযুক্ত হয়।

যখন হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হয়, তখন শরীর দূরে পড়িয়া রহে না ; তখন স্বতই বাহু বাহুর নিকটে আকৃষ্ট হয়, কপোল কপোলে আসিয়া সংলগ্ন হইতে চাহে। দেহ মন আত্মা একত্র হইয়া জমাট্ বাঁধিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতে গেলে প্রেমকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। প্রেমের মধ্যে এই সকলই অত্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে একীকৃত হইয়াছে।

এখন, যে কবি তাঁহার কাব্যে প্রেমকে তাহার এই স্বাভাবিক অখণ্ড মহিমায় যেরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন সেই অনুসারে তাঁহার কাব্যের গৌরব। যিনি প্রেমকে কেবলমাত্র শারীরিক শৃঙ্গারসম্ভোগে অভিব্যক্ত করেন, তাহার সহিত অন্তরের কোনপ্রকার সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহার মহত্ত্ব নাই—তিনি এমন একটি সীমাবদ্ধ ব্যাপারের মধ্যে তাঁহার কাব্যকে স্থাপন করেন যেখানে অক্লান্ত আনন্দ সম্ভোগের স্থান নাই, যেখানে মানবহৃদয়ের তৃপ্তি অতি শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যায়। যে কবি শরীরের উপরে প্রেমের প্রতিষ্ঠা না করিয়া তাহাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহারই কাব্যে সম্ভোগের প্রসর অনন্ত বিস্তৃত। কান টানিলে যেরূপ মাথা আসিয়া পড়ে, অন্তরের প্রেম সেইরূপ মনের সহিত সমস্ত শরীরকেও টানিয়া আনে, এবং সেই সঙ্গে শরীর মনের অতীত এক অপরিসীম আনন্দলোকের অপরূপ সৌন্দর্য্যজ্যোতি দীপ্যমান হইয়া উঠে। কিন্তু যাঁহারা

শরীরকে হেয়জ্ঞানপূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতেই মনকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া প্রেমকে ধ্যানমাত্রে অভিব্যক্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সে প্রেম আকারবিহীন নিষ্ফল। কারণ, প্রেমের ধর্ম্মই এই যে, সে প্রিয়জনকে দর্শন করিতে চাহে, স্পর্শ করিতে চাহে, তাহার কাছাকাছি থাকিতে পারিলে সুখানুভব করে। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিতে গেলে, শরীর-মাত্রগত সম্ভোগ ও দর্শনস্পর্শনাকাঙ্ক্ষাহীন অতিসূক্ষ্ম ধ্যান-মাত্রগত সম্ভোগ—মৃতদেহ ও প্রেতাত্মা—উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষম। জীবন্ত মানবই—আত্মাধিষ্ঠিত দেহই—মানবের শরীর মন আত্মাকে সমগ্রভাবে আকর্ষণ করিয়া মনুষ্যত্বকে সফল করিতে পারে।

এই সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ প্রেমের বিস্তৃতি ও প্রগাঢ়তানু-সারেই আমরা প্রেমসাহিত্যে গীতগোবিন্দের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, গীত-গোবিন্দে অঙ্গে অঙ্গে যে মদনতরঙ্গ উঠিয়াছে তাহার পরিতৃপ্তি কোথায়।

অঙ্গের সম্বন্ধ আছে বলিয়া পাঠকেরা বিচলিত হইবেন না। মনের সহিত এই দেহও দেবতারই দান। এবং প্রেমের পুণ্য হোমাগ্নিতে মন ও বাক্যের সহিত শরীরও চিরদিন আহুতি প্রদত্ত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইন্ধনে যেমন হোমাগ্নি সংরক্ষিত হইলেও সেই অগ্নিশিখা দেবতার উদ্দেশে উত্থিত হয় বলিয়াই তাহার গৌরব, প্রেমাগ্নিও সেইরূপ অঙ্গে

অঙ্গে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া যে অন্তরতম গভীরতম পুণ্য আকাঙ্ক্ষার দিকে নির্দ্দেশ করে তাহাতেই তাহার এত মাহাত্ম্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে বিদ্যাপতির কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির কবিতা নব্য রুচি অনুসারে সর্ব্বত্র যে খুব শ্লীল তাহা বলা যায় না। এবং তাঁহার কাব্যে শরীরের প্রতি শরীরের আকর্ষণ যথেষ্ট সূচিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্যাপতির কবিতার স্থান বহু উচ্চে। কারণ এই যে, তাঁহার কবিতায় শরীর শরীরের সহিত মিলিত হইয়া সেই প্রেমকেই চরিতার্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, যে প্রেম যতই প্রগাঢ় হয় ততই অপরিতৃপ্ত এবং ততই তাহার সম্ভোগানন্দ।

সখিরে, কি পুছসি অনুভব মোর।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়নু,
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

যত যত রসিক জন রস অনুগমন,
অনুভব কহে, না পেখে,
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে।

এখানে কেবলমাত্র প্রেমের শীতল ইন্ধন সংগৃহীত হয় নাই, কিন্তু সেই দীপ্ত অগ্নিশিখা বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। শুদ্ধ শরীরমাত্র সম্ভোগ হইলে অনুরাগ তিলে তিলে এমন নূতন হইয়া উঠিত না, প্রতি মুহূর্ত্তে ম্লান ও জীর্ণ হইয়া পড়িত। রূপ দেখিতে দেখিতে নয়ন তৃপ্ত হইয়া আসিত, কথা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ অসাড় হইয়া পড়িত, হৃদয় হৃদয়ের উপরে ভার বোধ হইত, এবং কেলি ক্লান্তিতে পরিণত হইতে বিলম্ব হইত না। শ্রান্তি শরীরের ধর্ম্ম। কিন্তু অন্তরের প্রেম এ ক্ষণিক সম্ভোগমাত্র নহে। অন্তরও রূপ দেখে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে না। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া প্রিয়জনকে হৃদয়ে রাখিয়াও তাহার পরিতৃপ্তি নাই। সে প্রগাঢ় প্রেম কেলি-কলামাত্রে চরিতার্থ হয় না; সে যতই পায় ততই চায় এবং প্রিয়জনকে প্রাণপণে যতই বক্ষে চাপিয়া ধরে কিছুতেই মনের মত করিয়া পায় না।

জয়দেবে এই চির-অতৃপ্ত প্রগাঢ়তা কোথাও চোখে পড়ে না। গীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয়, ন্যায়শাস্ত্রবর্ণিত অন্ধের ন্যায় প্রেমের বিপুল বহন বহিরঙ্গেই জয়দেব হাত বুলাইয়া

গিয়াছেন; তিনি খণ্ড খণ্ড সম্ভোগে প্রেমকে বিক্ষিপ্তভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, অন্তরের অসীমতার দ্বারে ধূলি-স্তূপ উচ্চ করিয়া দ্বাররোধ করিয়াছেন, সে ধূলি পুষ্পরেণুর ন্যায় সুগন্ধ হইতে পারে, স্বর্ণরেণুর ন্যায় সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চতর সৌন্দর্য্যরাজ্যের পথে বাধাস্বরূপ।

এই সহজপরিতৃপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগবিলাস কতকগুলি চির-প্রচলিত শরীরসম্বন্ধীয় উপমাসন্নদ্ধ হইয়া এক মেরুদণ্ডবিহীন ললিত গলিত ছন্দের উপর ভর করিয়া নিতান্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়া স্খলিত ও লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

ছন্দও যেমন পিচ্ছিল, জয়দেবের সুন্দরীগণের যৌবন-সন্নদ্ধ অঙ্গসমূহ তদপেক্ষা অধিক পিচ্ছিল, এবং এই সুদীর্ঘ শৃঙ্গারকলুষ বর্ণনায় পাঠকের মনে সে সৌন্দর্য্যও সামান্যমাত্রও বসে না। শ্লোকের পর শ্লোক ধারাবাহিক সমভাবাপন্ন শৃঙ্গার-প্রতিধ্বনি মাত্র। সর্গের পর সর্গ—হয়, সখীমুখে, নয়, রাধামুখে, নয়, কৃষ্ণমুখে—সেই একই কথা। কখনও সখী অন্তরাল হইতে রাধিকাকে দেখাইয়া দেয় যে, সহস্র গোপবালাগণের নিবিড় আলিঙ্গনভরে কৃষ্ণের বক্ষস্থল কিরূপ নিপীড়িত হইতেছে; কখনও বা রাধা সখীর নিকট আত্ম-মনোরথ ব্যক্ত করিতে করিতে অনঙ্গবিলাসের প্রত্যেক অঙ্গ বর্ণনা করিয়া যান। পরের সর্গে শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী অবলম্বনে অনঙ্গকে অঙ্গবদ্ধ করিয়া তুলেন। আবার সখী আসে, সখী যায়—এবং প্রত্যেকেই বারবার সেই একই

চুম্বন কটাক্ষ পঞ্চশর ও তদানুষঙ্গিক যাবতীয় পীবর বিলাস বর্ণনা করে। এবং এইরূপে প্রভাতকালে খণ্ডিতা রাধিকার হৃদয়ে মানের আবির্ভাব ও সখীজনমুখে পল্লবশয্যাগত কন্দর্প-বিলাসের সুখশ্রবণে সন্ধ্যাকালে রাধার সম্পূর্ণ ভাবান্তরের মধ্য দিয়া অনঙ্গবিলাস বর্ণনার পর বর্ণনায় অগ্রসর হইতে থাকে। এবং এই শ্লোকশ্রেণীর মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে পাঠকের মনে শ্রান্তি ও তদানুষঙ্গিক বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই বিরক্তি উদ্রেকের একটা প্রধান কারণ এই যে, জয়দেবের কবিতা ক্রমাগত কর্ণে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজনক শব্দ বর্ষণ করিয়া যায় 'কিন্তু কল্পনাপটে কোন চিত্র অঙ্কিত করে না। ইন্দ্রিয়ের উপভোগশক্তি সীমাবদ্ধ, সে অতি অল্পেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ জয়দেবের দীর্ঘ ছন্দের মধ্যে কাঠিন্যলেশ না থাকাতে বৈচিত্র্য অভাবে চিত্তকে শীঘ্রই অসাড় করিয়া ফেলে। চিত্রের দ্বারাও মন আকৃষ্ট হয় না, শব্দবৈচিত্র্যেও কর্ণ জাগ্রত হয় না, অনুপ্রাসসঙ্কুল অবিরলতরল বাক্যবিন্যাসে মানসরসনার রসবোধ ক্রমশ যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া আসে।

গীতগোবিন্দের গীত-অংশে চিত্র নাই, কেবল ধ্বনি আছে। ধ্বনির দ্বারা চিত্র এবং ভাবের উদয় করা বিশুদ্ধ সঙ্গীতের কার্য্য। কবিতার ছন্দোবন্ধের মধ্যে যেটুকু ধ্বনি থাকিতে পারে সঙ্গীতের তুলনায় তাহা অসম্পূর্ণ—এই

কারণে কবিতায় ছন্দের ঝঙ্কার ব্যতীতও ভাবপ্রকাশের অন্য উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয়।

কিন্তু গীতগোবিন্দের গানগুলিতে ঝঙ্কার বাদ দিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বর্ণনাগুলি নিতান্ত সাধারণভাবে। একজন অন্ধও সেরূপ বর্ণনা কেবল জনশ্রুতি অবলম্বনে লিখিতে পারেন। তাহাতে কবির সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ এবং স্বাভাবিক প্রতিবিম্বগ্রাহিতা নাই। বসন্তবর্ণনায় "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে" কেবল লকার-লম্বিত ধ্বনির লহরীলীলা মাত্র, তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট চিত্র নহে।

কবিতায় চিত্র কাহাকে বলে তাহা জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দের সূচনাশ্লোকের প্রথম দুই ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন —

> মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
> র্নক্তং ———————— ।

নিম্নে বনভূমি তমালদ্রুমে শ্যাম, এবং ঊর্দ্ধে আকাশ মেঘে মেদুর, এবং সমস্ত রাত্রি। অন্ধকারের উপর অন্ধকার—তাহার উপর সুগম্ভীর শব্দের এবং মেঘমন্দ্র ছন্দের ঘনঘটা। একমাত্র "নক্তং" শব্দ, তাহার ক্রিয়া নাই বিশেষণ নাই আনুষঙ্গিক পদ নাই, কেবল একটি কথামাত্রে একটি অখণ্ড তামসী রাত্রি দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এইখানে বলা আবশ্যক গীতগোবিন্দ প্রকৃতই গীত। তাহা সুরসংযোগে গেয়। একদিন তাহা রাজসভায় গীত

হইয়াছিল। সে রাগিণী অদ্য আমাদের নিকট মৌন—সুতরাং আমাদের নিকট গীতগোবিন্দ অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, গীতে যেরূপ বাক্য-বিন্যাস হওয়া উচিত গীতগোবিন্দ তাহার আদর্শস্থল। সঙ্গীতে আমাদেব মনে যেরূপ ভাবের উদ্রেক করে তাহা চিত্রের ন্যায় সুনির্দ্দিষ্ট নহে। তাহা একপ্রকার অব্যক্ত অথচ সুতীব্র, অগ্নিশিখার ন্যায় তাহার উত্তাপ এবং আলোক এবং স্পন্দন আছে, কিন্তু তাহার আকার আয়তনের কাঠিন্য এবং নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নাই—তাহাকে প্রবলভাবে অনুভব করিতে পারি অথচ মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ কবিতে পাবি না।

এই জন্য গানের কথা অত্যন্ত সবল এবং সাধারণ ভাবের হওয়া উচিত। নতুবা কথা সুরের অনুগামী না হইয়া স্বপ্রধান হইয়া উঠে। কথা যদি ভাবকে কোন বিশেষরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয় তবে সঙ্গীত সেই বন্ধনে পীড়িত হইতে থাকে।

গীতগোবিন্দেব ভাষা সর্ব্বাংশেই সঙ্গীতের সহায়তা করিয়াছে, কোথাও প্রতিকূলতা করে নাই। অনুপ্রাসে এবং কথার লালিত্যে সঙ্গীতের ঝঙ্কার বর্দ্ধিত করিয়া তোলে এবং ভাবের বিরলতা ও সরলতায় রাগরাগিণী অব্যাহতভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে।

সঙ্গীতে চিত্রবৈচিত্র্য এবং কল্পনাকৌশলের স্থান নাই,

কেবল সাধারণভাবে একটি স্থায়ী রস অবলম্বন করা আবশ্যক। জয়দেব শৃঙ্গার রস আশ্রয় করিয়াছেন—এবং এই রসকেই স্বরোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছেন।

এই শৃঙ্গারসম্ভোগই গীতগোবিন্দের দেহ অথবা প্রাণ যাহা বল। এবং সমালোচকেরা ইহাতেই জয়দেবের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ, ইহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিক মিলনেরই শরীরী রূপক। এবং জয়দেব নিজেই বলিয়াছেন যে, যদি হরিস্মরণে মন সরস হয় তবে জয়দেব-সরস্বতী শ্রবণ কর।

সুতরাং শারীরিক সম্ভোগেরই বর্ণনা বলিয়া গীতগোবিন্দকে নিকৃষ্ট শ্রেণীব কাব্য বলা যায় না। কবি যদি সেই ঈশ্বরের ভাবে তন্ময় হইয়া সাধারণ সম্ভোগের ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে এমনই কি দোষ হইয়াছে? হাফেজ ত বারবার মদিরাপানের কথা বলিয়াছেন এবং মর্ত্ত্য বিরহের ভাষাতেই প্রিয়জনের জন্য বিলাপ করিয়াছেন। তাঁহাকে ত কেহ সে জন্য অপরাধী করে না।

বাস্তবিক, ভাবুকের অন্তরে এমন একটি স্থান আছে যেখানে আসিয়া মনুষ্যত্বের সহিত দেবত্বের মিলন সংঘটিত হয়। এবং সেই সঙ্গমক্ষেত্রের ভাষা মানবকবির রচনায় কতকটা এই মর্ত্ত্য প্রেম ও সম্ভোগের ভাষারই অনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে না—কেবল হৃদয়ের একটি নিবিড় প্রগাঢ়তা ব্যক্ত হয়, যে তন্ময়ী

প্রগাঢ়তা এই মর্ত্ত্যধামে দম্পতির শরীর মনের ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয় এবং হৃদয় হৃদয়ের ও সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বাঙ্গের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে।

কেবলি যে, দাম্পত্য প্রেমেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় এমনও নহে। সকল প্রেমই যাঁহা হইতে নিঃসৃত সেই প্রেমস্বরূপকে প্রেমের যে কোন ভাবে উপলব্ধি কর তিনি তাহাতেই প্রকাশমান। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখিয়া তাঁহার সহিত পুত্রের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতে এই মাতাপুত্রভাব মর্ত্ত্য মাতাপুত্রেরই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ঈশ্বরকে নানা ভাবে দেখিয়াছে। এবং বৈষ্ণব সঙ্গীতে মানব ভাবই প্রগাঢ় হইয়া সেই সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছে। এই যে রাধাকৃষ্ণের রূপক ইহা ত সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই অঙ্গ। বৈষ্ণব জয়দেব গোস্বামী যদি ইহা লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাহাতে ঈশ্বরতন্ময়তার পরিবর্ত্তে শরীরতন্ময়তাই প্রকাশ পাইবে কেন ?

কারণ এই যে, জয়দেব ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া গীতগোবিন্দ রচনা করেন নাই। হরিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়ত তাঁহার লক্ষ্য ছিল কিন্তু বিলাসকলায় কুতূহল উদ্রেক করিয়া দেওয়া তদপেক্ষা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল না। আধ্যাত্মিক সমালোচকেরা স্বপক্ষে যে শ্লোকের কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, সেই শ্লোকটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই পাঠকেরা ইহার প্রমাণ পাইবেন।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীং।

স্বতরাং জয়দেব যে, হরিস্মরণ এবং বিলাসকলা উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বল মানবহৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরিস্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধারণতঃ কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এবং গীতগোবিন্দের কবিও এই মানবস্বভাবসুলভ দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া আশঙ্কা হয়।

তিনি রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সেই যে কুঞ্জপ্রবেশ করিয়াছেন তদবধি এই বিলাসকলাই রচনা করিতেছেন। এবং তাঁহার কাব্যে আদিরসের সমস্ত বাহ্য উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল কবির যে আত্মবিস্মৃতিটুকু থাকিলে এই সমস্ত বিলাসকলাও সরল ভাবে নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠিত তাহাই নাই।

এই অতি সচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে। শৃঙ্গাররসও নহে, সম্ভোগবর্ণনাও নহে, মদনতরঙ্গও নহে, মানবদেহও নহে।—প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নব্য রুচির বিরুদ্ধ ভাষায় এমন অনেক কথা স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋগ্বেদের পুরুরবা ও উর্ব্বশী উপাখ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে।* ঋগ্বেদের এই নগ্ন বর্ণনায় অশ্লীলতা রুচি অরুচি শরীর মন এসমস্ত অতি সূক্ষ্ম ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়া হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে এমন একটি দীপ্তি

* ৮ অষ্টক, ৫ অধ্যায়, ১০ মণ্ডল ৯৫ সূক্ত।

প্রকাশিত হইয়াছে যাহাতে সমস্ত পাপ, সমস্ত অবিশুদ্ধি নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

জয়দেবে এই সহজ স্বাভাবিকতাটুকু নাই। সম্ভোগবর্ণনা তাঁহার হৃদয় হইতে সহজ আবেগভরে বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই, বিলাস উদ্রেক মানসে ইঙ্গিতে ইসারায় নানা ছলে তিনি সমস্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি গরল সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। এই নাগরিকতা, এই ঠারই সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য।

নহিলে, মানবের শরীরও হেয় নহে, উলঙ্গতাও অপবিত্র নহে। উলঙ্গ যোগীকে দেখিয়া কেহ ত সঙ্কোচ অনুভব করে না। বরঞ্চ সেই নগ্ন দেহই পুণ্যদর্শন বলিয়া গণ্য হয়। উলঙ্গ শিশু কাহারও চক্ষে অপবিত্র নহে। এবং বন্য মানবের উলঙ্গতাও অশোভন বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ আর কিছুই নহে, ইহার মধ্যে কোনরূপ ঠার নাই, ইঙ্গিত ইসারা নাই, নাগরিকতা নাই।

গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া কেহ ত অশ্লীল বলে না। প্রকৃতির অন্তর হইতে সেই নগ্ন গঠন যেন স্বভাবতই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার আবরণ নিষ্প্রয়োজন। আবরণের কথা সেখানে মনেই আসে না।

কিন্তু এই গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্ত্তির পার্শ্বে ফরাসী চিত্রশালার একখানি নগ্নদেহ চিত্র স্থাপিত কর, সে অকুণ্ঠিত সম্ভ্রম নাই, সে দীপ্ত গৌরব নাই। ফরাসী চিত্রকর ঐ নারীমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে

হইতে বসন স্খলিত করিয়া দিয়া পায়ে হয়ত জুতা রাখিয়াছেন, কিম্বা এমন করিয়া এমন কিছু রাখিয়াছেন যাহাতে এই বর্ত্তমান শতাব্দীর বসনভূষণের একটি ভাব মনে করাইয়া দেয় এবং এই বিবসনতার মধ্যে একটা সচেতন উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করে।

বৈদিক পুরুরবা ও উর্ব্বশী চিত্রের পার্শ্বে জয়দেবের সম্ভোগচিত্রাবলী এইরূপ। এবং হরিস্মরণ ত দূরের কথা, মনুষ্যত্বেরও বিকাশ এখানে অত্যন্ত সঙ্কুচিত। এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ আছেন কি না আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

---

# পশুপ্রীতি।

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের সহিত সমস্ত জীবজগতের প্রতি একটি প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখা যায়। গোযূথ, চক্রবাকমিথুন, কলহংস এবং মৃগশাবক সংস্কৃত সাহিত্যরাজ্যের একটি সুবৃহৎ সামাজিকতার মধ্যে কেমন সুন্দর স্থান অধিকার করিয়া আছে—মানুষের সুখদুঃখ এবং দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে তাহারা কেমন সহজে অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা আমাদের যেন পর নহে, ঘরের লোকের মত।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে পশুজাতির প্রতি মমতা ব্যক্ত হয় নাই একথা বলিলে নিতান্তই অত্যুক্তি হইয়া পড়ে। মূষিককে সম্বোধন করিয়া কবি বার্ণসের যে করুণার্দ্র বাৎসল্যপূর্ণ কবিতাটি আছে তাহার তুলনা অন্য দেশের কোন কবিতায় পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সংস্কৃত সাহিত্যে ত দেখা যায় না।

কিন্তু আমার বিবেচনায় না থাকিবার একটি কারণ আছে। কবি বার্ণসের যে কবিজন-সুলভ মমত্ব, তাহা যেন চতুর্দ্দিকের নির্দ্দয়তার নিপীড়নে কিছু সচেতন বেগে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি জানেন এই অসহায় জীবকে কেহ দয়ার চক্ষে দেখে না, তিনি জানেন অকারণে খেলাচ্ছলে পশুহত্যা মানুষের আমোদের একটা অঙ্গ হইয়া গেছে, সেই জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে বাধা এবং ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দয়া এমন প্রবলভাবে স্নেহসঙ্গীতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে কবিহৃদয়ের দয়া চতুর্দ্দিকের সমাজ কর্ত্তৃক সেই বেদনা প্রাপ্ত হয় নাই, এই জন্য তাহা উচ্ছ্বসিত গীতে পরিণত হইতে পারে নাই, তাহা কেবল একটি আত্ম-বিস্মৃত অচেতন স্নেহে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। প্রকৃতি, পশু এবং মানব একটি সহজ প্রেমে যেন এক গার্হস্থ্যের অঙ্গ হইয়া বিরাজ করিতেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে মৃগয়া ছিল না তাহা নহে, কিন্তু ক্রীড়ার্থে পশুহনন কেবল রাজাদের মধ্যে বদ্ধ ছিল—সাধারণ

হিন্দুপ্রকৃতির সহিত উক্ত কার্য্যের যেন একটা অসামঞ্জস্য ছিল। সেই জন্য মৃগয়ায়—অন্য দেশের কবি যেখানে অশ্বের হ্রেষারবে ও কুক্কুরগণের উল্লাসকোলাহলে উৎসাহিত হইয়া শোণিতাক্তকলেবর পলায়মান পশুর পশ্চাতে জয়োল্লাসে ধাবমান হয়েন—সংস্কৃত কবির করুণ হৃদয় সেই প্রাণভয়ে পলায়মান আর্ত্তের দুঃখে বিগলিত হইয়া আসে এবং তাঁহার শিকারদৃশ্য উল্লাসের পরিবর্ত্তে করুণাই উদ্রেক করে।

কাদম্বরীর প্রারম্ভেই ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। শুকমুখে বাণভট্ট যেখানে ব্যাধগণের অত্যাচার উপদ্রবের বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার এই সহৃদয়তা, পশুজগতের প্রতি—অহিংসা মাত্র নহে—আন্তরিক নিবিড় অনুরাগ, বর্ণনার পর বর্ণনায় প্রতি ছোটখাট ঘটনার উল্লেখে কেমন প্রগাঢ় হইয়া ফুটিয়াছে।

সেই যমদূতসদৃশ বিকটমূর্ত্তি জবালোহিতচক্ষু নিষ্ঠুর শবরসেনা, নরকের দ্বারপালসদৃশ ভীষণ সেনাপতি, প্রাণভয়ে পলায়মান সিংহ মাতঙ্গ কুরঙ্গগণের গর্জ্জন ও চীৎকারে আলোড়িত বনরাজি, অরচ্ছবরের নৃশংস পক্ষীবধব্যাপার ও নিরীহ পক্ষীকুলের অন্তরে দারুণ ভীতিসঞ্চার, প্রতি বর্ণনায় বাণভট্টের অন্তর হইতে বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায়, পাশবদ্ধ পক্ষীশাবকের ন্যায় একটি করুণ আর্ত্তনাদ বাহির হইয়াছে, যে করুণ স্বরে ব্যাধগণের সমস্ত উল্লাসকোলাহল ডুবিয়া গিয়াছে।

কাদম্বরীর গ্রন্থকার যে অধিক হা হুতাশ করিয়াছেন তাহা নহে, এবং মৃগয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অহিংসার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দীর্ঘ নীতি-উপদেশও প্রদান করেন নাই, কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে সমস্ত বর্ণনায় একটি গভীর সহানুভূতি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। বৃদ্ধ শবরের পক্ষীবধ বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে বোধ করি ক্ষতি নাই।

কিমিব হি দুষ্করমকরুণানাং যতঃ স তমনেকতালতুঙ্গমভ্রঙ্কষশাখা-শিখরমপি সোপানৈরিবাগত্বৈনৈব পাদপমধিরুহ্য তাননুপজাতোৎপতন-শক্তীন্, কাংশ্চিদল্পদিবসজাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শাল্মলিকুসুমশঙ্কা-মুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুদ্ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিনসংবর্ত্তিকানুকারিণঃ কাংশ্চিদর্কোপলসদৃশান্, কাংশ্চিল্লোহিতায়মানচঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্বিঘট্টিত-দলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্বহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃ-কম্পব্যাজেন নিবারয়ত ইব, প্রতীকারাসমর্থান্, একৈকশঃ ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখাসন্ধিভ্যঃ কোটরান্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ" অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ।

এই পক্ষীশাবকগুলির বর্ণনাই কি সকরুণ! কেহ এখনও উড়িতে শিখে নাই, কেহ অতি অল্পদিন হইল জন্মিয়াছে সেই জন্য গর্ভচ্ছবিপাটলবর্ণ—যেন শাল্মলী কুসুমগুলির মত, কাহারও অল্প অল্প নূতন ডানা যেন পদ্মের নবদলের মত উঠিয়াছে, কাহারও লোহিতায়মান ক্ষুদ্র চঞ্চু যেন পদ্মকলির একটুখানি খোলা মুখটুকুর মত, কেহ বা অবিরত শিরঃকম্প দ্বারা এই নিষ্ঠুরকে যেন তাহার অকরুণ কার্য্যে নিবারণ করিতে চাহিতেছে। এই সমস্ত প্রতীকারে অসমর্থ বিহগ-

শিশুগুলিকে যেন এক একটি ফলের মত বনস্পতির শাখা-সন্ধি হইতে কোটরাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া নিষ্ঠুর শবর যখন গ্রীবা মোটনপূর্ব্বক ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কবির হৃদয়ে তখন কি শেলই বিঁধিতেছিল!

সেই জীর্ণ শাল্মলী-তরুকোটরে বহু-যুগ ধরিয়া বহু পক্ষী-বংশ নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া আসিতেছে। প্রভাত হইলে তাহারা দিকে দিকে আহারান্বেষণে বহির্গত হয় এবং আহারা-নন্তর প্রত্যাগত হইয়া কুলায়াবস্থিত শাবকদিগকে চঞ্চু-পুটের দ্বারা শালিধান্তমঞ্জরী খাওয়াইয়া দেয় এবং শাবককে ক্রোড়ান্তে নিহিত করিয়া সেইখানেই দীর্ঘ নিশা যাপন করে।

একটি জীর্ণ কোটরে একটি বৃদ্ধ শুকদম্পতি বাস করিত। বৃদ্ধবয়সে তাহাদের একটি সন্তান হয়। প্রবল প্রসব-বেদনায় অভিভূত হইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই আহার জননী প্রাণত্যাগ করিল। বৃদ্ধ পত্নীবিয়োগে অতি-মাত্র কাতর হইলেও সুতস্নেহবশতঃ শাবকের লালনপালন ও তৎসম্বর্দ্ধনে যত্নবান্ হইয়া একাকী কায়ক্লেশে দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করিতে লাগিল। বয়সের আধিক্যহেতু ও বহুদিনের অনভ্যাসবশতঃ তাহার আর উড়িবার শক্তি ছিল না। নব শেফালিকাকুসুমবৃন্তের ন্যায় পিঞ্জরবর্ণ চঞ্চুপুট দ্বারা পরনীড়নিপতিত শালিবল্লরী হইতে তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিয়া ও তরুমূলনিপতিত শুককুলাবদলিত ফলশকল সংগ্রহ করিয়া

শাবককে আহার করাইত এবং শাবকের ভুক্তাবশিষ্ট নিজে আহার করিত।

সে দিন প্রভাতে মৃগয়াকোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া শবরকে তরু অভিমুখে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর ভয়ে দ্বিগুণতর কম্পিত হইতে লাগিল, তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, এবং অশ্রুপরিপ্লুত ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সন্তানস্নেহপরবশ বৃদ্ধ, শাবককে পক্ষপুটে আচ্ছাদিত করিয়া প্রাণপণে বক্ষতলে চাপিয়া রহিল। শবর যখন তাহার কুলায়সমীপে আসিয়া কোটরের মধ্যে স্বীয় বিবিধবনবরাহবসাবিস্রগন্ধী অনবরত কোদণ্ডগুণাকর্ষণহেতু ব্রণাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠ যমদণ্ডসদৃশ বাম বাহু প্রবেশ করাইয়া দিল, বৃদ্ধ চঞ্চুদ্বারা তাহাকে যথাশক্তি আঘাত করিল, কিন্তু সে বাহুপাশ ছাড়াইতে পারিল না। শবর তাহাকে বাহির করিয়া বধ করিল এবং বক্ষতলে শিশুসহ বৃদ্ধ শুক ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

এই শিশু শুক কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজসন্নিধানে আপন পিতার অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে।—

তাতস্তু তং মহান্তমকাণ্ডএব প্রাণহরমপ্রতীকারমুপপ্লবমুপনতমবলোক্য দ্বিগুণতরোপজাতবেপথুঃ, মরণভয়াদুদ্ভ্রান্ততরলতারকাং বিষাদশূন্যামশ্রুজলপ্লুতাং দৃশমিতস্ততো দিক্ষু বিক্ষিপন্, উচ্ছুষ্কতালুরাত্মপ্রতীকারাক্ষমঃ, ত্রাসস্রস্তসন্ধিশিথিলেন পক্ষপুটেনাচ্ছাদ্য মাং তৎকালোচিতপ্রতীকারং মন্যমানঃ স্নেহপরবশো মৎকাতরঃ কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ়ঃ

ক্রোড়ভাগেন মামবষ্টভ্য তস্থৌ। অসাবপি পাপঃ ক্রমেণ শাখান্তরৈঃ সঞ্চরমাণঃ কোটরদ্বারমাগত্য, জীর্ণাসিতভুজঙ্গভোগভীষণং প্রসার্য বিবিধ-বনবরাহবসাবিস্রগন্ধিকরতলমনবরতকোদণ্ডগুণাকর্ষণব্রণাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠমন্ত-কদণ্ডানুকারিণং বামবাহুমতিনৃশংসো মুহুর্মুহুর্দত্তচঞ্চুপ্রহারমুৎকূজন্তং তমা-কৃষ্য তাতমপগতাসুমকরোৎ।

এই দৃশ্যে কবির সহানুভূতি কোন্‌খানে তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। বৃদ্ধ শুক তাহার পত্নীবিয়োগের পর যে কত কষ্ট এবং কত স্বার্থত্যাগ স্বীকারপূর্ব্বক আপন শাবকটিকে প্রাণপণে পালন করিয়া আসিয়াছে এবং সেই অনেক দুঃখের পালিত সন্তানটিকে রক্ষা করিবার জন্য যে কি যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মরিল—এই বর্ণনাতেই কবিহৃদয় সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছে। পক্ষীকুলের অন্তরের মধ্যে তিনি কেমন প্রবেশ করিয়াছেন! কেমন সহৃদয়তার সহিত সুন্দররূপে তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমাদের সন্তান আমাদের নিকট যেমন প্রাণাধিক প্রিয়, পাখীর সন্তানও পাখীর কাছে ঠিক সেইরূপ। ভিন্নজাতীয় জীবের প্রতি করুণা সঞ্চার করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা কল্পনা অভাবে অন্য জীবের সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারি না, কবি যখন দেখাইয়া দেন, আমাদের জননীর বাৎসল্য পিতার স্নেহ জীবনের মমতা ঐ ভাষাহীন পাখীর নীড়ের মধ্যেও আছে, তখন সেই "Touch of nature makes the whole world kin." তখন আমাদের

হৃদয় সমস্ত অনাথ জীবজন্তুর প্রতি আত্মীয়ভাবে ধাবিত হয়।

কেবলমাত্র কাদম্বরীতে নহে, জীবজগতের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি সংস্কৃত কাব্যে প্রায়ই দেখা যায়। রঘুবংশের নবম সর্গে মৃগয়ার মধ্যস্থলে রাজা দশরথের লক্ষ্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য সহচরী হরিণী প্রিয়তম হরিণকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, এবং তদ্দর্শনে কঠিন রাজহৃদয়েও দাম্পত্যের নিবিড় অনুরাগ ঘনাইয়া আসে; শিখীকুলের বর্হবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া উদ্যত বাণ তূণীরে ফিরিয়া আসে, এবং এই মৃগয়াসক্ততার মধ্যেও মানবহৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সকরুণ স্নেহ ক্ষরিত হইতে থাকে।

শকুন্তলার প্রথম দৃশ্যেও দুষ্মন্তের মৃগানুসরণে কালিদাসের এই গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। নহিলে, উদ্যতবাণ দুষ্মন্তের মুখ দিয়া তিনি সেই গ্রীবাভঙ্গাভিরাম সৌন্দর্য্য বর্ণনা করাইবেন কেন? এরূপ সহৃদয়তার সহিত যে প্রাণভয়ে ধাবমান পশুর সৌন্দর্য্য অনুভব করে, চতুরা মৃগয়া তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিতে পারে নাই।—ঋষি রাজাকে শরসন্ধানে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যে শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা যেন পশুবৎসল ভারতবর্ষের ব্যথিত হৃদয়ের ভাষা। আহা, এই হরিণকের অতিলোল জীবনটি কতটুকুই বা, আর কোথায় তোমার বজ্রসার শর—পুষ্পরাশির মধ্যে কি আগুন ধরাইতে আছে! কবি বড় করুণার সহিত এই কথা বলিয়া-

ছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মৃগয়া আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা নিবারণের উদ্যত বাহু আছে—মনের সহিত সেই নিষ্ঠুর প্রমোদে কবি যোগ দিতে পারেন নাই।

কালিদাস পশুজগতের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। তপোবনে কামধেনু নন্দিনীর সেবার কথা পাঠ কর। সেই অনিন্দ্যতনু ধেনুর নবকিসলয়সদৃশ চিক্কন পাটল বর্ণ ও ললাটতটে প্রদোষসময়ের নবোদিত শশিকলাসদৃশ ঈষৎ বক্র শ্বেত রেখা বর্ণনা করিয়া কবি কত আনন্দ লাভ করিয়াছেন। রাজা যখন রথারোহণে গুরুগৃহে অথবা মৃগয়ায় বাহির হন, কালিদাস সমস্ত পথ তাঁহার অশ্বের নিভৃতোর্দ্ধকর্ণ নিষ্কম্পচামরশিখা গতিবেগসৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলেন; এবং কি বশিষ্ঠাশ্রমে, কি মালিনীনদীতীরে, রথ হইতে অবতরণকালে রাজমুখে অশ্বদিগকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ দিতে কখনও ভুলেন না।

এই সহানুভূতি শকুন্তলার বিদায়দৃশ্যে—যেখানে হরিণশিশু বারবার অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে এবং হরিণশিশুর স্নেহে শকুন্তলার নয়ন ছলছল করিয়া আসে—সেইখানেই সম্যক্ মনোহারী হইয়া উঠিয়াছে। নিপুণ চিত্রকর কালিদাস এইরূপে চতুর্দ্দিকের সুন্দর প্রকৃতির মধ্যস্থলে মানবের সহিত মৃগহৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাঁধিয়া দিয়া যে একখানি সুন্দর চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাহার মর্ম্মস্থলে কবিহৃদয়ের অনেকখানি

বেদনা, পশুজগতের প্রতি অনেকখানি সহানুভূতি যেন আপনা হইতে নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে।

ভবভূতির নাটকেও এ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। উত্তর-চরিতের তৃতীয় অঙ্কে সীতার পালিত করিশিশু ও ময়ূরবর্ণনায় এই অনুরাগ অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতি পশু এবং মানবের সম্মিলনে সংস্কৃত কবির হৃদয় কিরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে।—শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কের সহিত উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্ক, বিদায় এবং পুনর্মিলন দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ক হইলেও, দৃশ্যাংশে নিতান্ত বিসদৃশ নহে। এবং ভাবের ঐক্যে উভয় নাটকের পাত্রপাত্রীগণও যেন এইখানে কতকটা ঘনিষ্ঠ হইয়া আসে।

সংস্কৃত কাব্যের সর্ব্বত্রই জীবজগতের প্রতি এই উদার সহানুভূতি দেখা যায়—এবং ইহাতে ভারতবর্ষেরই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। বাস্তবিক জগতে কোথাও সিংহে হস্তীতে, ব্যাঘ্রে মৃগে সদ্ভাব দেখা যায় না, সেই জন্যই ভারতবর্ষীয় কবি আপনার হৃদয়ের অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করিয়া কাল্পনিক তপোবনের মধ্যে সর্ব্বজীবের হিংসাহীন মিলনভূমির আদর্শ রচনা করিয়াছেন। শকুন্তলার তপোবনে কেবল যে তরুলতার সহিত মনুষ্যের প্রীতিবন্ধন, কেবল যে মৃগশিশুর প্রতি ঋষিকন্যাদের মাতৃস্নেহ তাহা নহে, নরবালকের সহিত সিংহশাবকের সাহচর্য্যে কবি সমস্ত

প্রাকৃতিক হিংসার সম্পর্ক ভুলিবার এবং ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই আদর্শের অনুগত ধর্ম্ম যদি পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও কালে পালিত হইয়া থাকে ত সে ভারতবর্ষে। আজি যে অধঃপতিত ভারত গো-রক্ষার জন্য নির্ম্মম বিদেশীর কঠোর উৎপীড়ন সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ নহে, সে কেবল এই পশু-জাতির প্রতি স্নেহবশতঃ। দুগ্ধবতী গাভী এবং হলবাহক বৃষ চিরকাল আমাদের গৃহপার্শ্বে পরিবারের সহিত স্থান পাইয়াছে। তাহারা আমাদিগকে স্তন্যদানে পালন করিয়াছে, অন্ন আহরণে সাহায্য করিয়াছে, তাহারা আমাদের নিত্য গৃহকর্ম্মের সহচর ও সহকারী। বিদেশীরা বলে, তাহা হউক্ না কেন, তবু ত গোরু জন্তু বটে, তাহার সহিত ভক্তি-বন্ধন ধর্ম্মবন্ধন কিসের? ভারতবর্ষ বলে, হউক্ না পশু, তবু ত সে আমার মাতার মত হিতকারিণী, সখার মত সুখ-দুঃখভাগী। পশু বলিয়াই যে, তাহার সহিত ব্যবহারে মানব-হৃদয়কে সঙ্কুচিত করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। অন্য জাতি যে ভাবটিকে বাড়াবাড়ি মনে করিয়া হাস্য করে আমাদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক। পশুপক্ষী, এমন কি, জড়-প্রকৃতির সহিতও ভারতবর্ষ আপনার হৃদয়ের সংযোগ অনুভব করে এবং তাহাদের প্রতি হৃদয়ের কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

পৃথিবীতে এমন অন্য কোন জাতি আছে কি না জানি

না, যে জাতি এককালে মাংসাশী ছিল অথচ ক্রমে মাংসাহার ত্যাগ করিয়া নিরামিশভোজী হইয়া উঠিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষেই দেখা যায়, মাংসাশী আর্য্যগণ মাংসভোজন ত্যাগ করিয়া তাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

পৃথিবীতে অন্য কোন দেশে এমন ধর্ম্মনীতি আছে কি না জানি না, যাহাতে প্রীতির সম্পর্ক মনুষ্যকে ছাড়াইয়া পশু-রাজ্যে বিস্তার করিবার অনুশাসন আছে। মনুষ্যপ্রেমে প্রাণসমর্পণ অন্য দেশের কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে উচ্চতম আদর্শ বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু ক্ষুধিত শ্যেনপক্ষীর জন্য নিজ দেহ হইতে মাংস কাটিয়া দেওয়ার কথা বোধ হয় গল্পচ্ছলেও কোথাও উচ্চারিত হয় না। আমাদের বৌদ্ধগ্রন্থে এরূপ গল্প কর্ত্তব্যের আদর্শ বলিয়া শত শত বার আখ্যাত হইয়াছে। এ আদর্শ অসঙ্গত এবং অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেও ইহা হইতে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি বুঝা যাইতে পারিবে। যেমন হিন্দুধর্ম্ম তেমনি বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈনধর্ম্মও যে ভারতবর্ষীয় হৃদয় হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে সে কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

পশুস্নেহ ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির যে এক প্রধান লক্ষণ তাহা একটি কাহিনীতে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। ব্যাধ যখন ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে বধ করিল তখনই বাল্মীকির মুখে ছন্দোবদ্ধ শ্লোক উচ্চারিত হইল। যুদ্ধ নহে, স্ত্রীপুরুষের প্রেম নহে, জীবে দয়াই ভারতবর্ষে প্রথম শ্লোক উৎপত্তির

কারণ। কথাটা ঐতিহাসিক সত্য না হইতে পারে, বাল্মীকির পূর্ব্বেও দেবস্তুতি উপলক্ষে অনুষ্টুভ্ ছন্দ রচিত হইতে পারে, কিন্তু গল্পটির মধ্যে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। সেটি এই যে, সর্ব্বভূতে দয়া ভারতীয় প্রকৃতির মূল উৎস। সামান্য একটি ক্রৌঞ্চপক্ষীহনন পবিত্র শ্লোকসৃষ্টির আদিকারণ বলিয়া যে দেশে প্রচলিত হইতে পারে, সে দেশের হৃদয়ের কথাটি কি তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না। এই জন্য

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥

এ শ্লোকটি পবিত্র শ্লোক। ন্যা—ব্যাধ কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, ভারতে সে চিরকাল অভিশপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে একটা পাখীর দুঃখ বুঝিতে পারে না, কামমোহিত বিহঙ্গকে যে অকাতরে হত্যা করিতে পারে, যাহার চিত্তবৃত্তি এতই অসাড় অচেতন, সে কখনই শাশ্বতী গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না—ইহার মধ্যে বড় একটি গভীর কথা আছে।—দুর্ব্বলের প্রতি স্নেহ, অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি পৃথিবীতে বড় কম। কিন্তু যেখানে ইহা দেখা যায় সেখানে মর্ত্ত্য স্বর্গ হইয়া উঠে, সেখান হইতে কুৎসিৎ অত্যাচার চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হয় এবং সেখানে বৃহৎ মনুষ্যত্ব সমস্ত বিশ্বকে আপন বক্ষনীড়ে টানিয়া আনিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে। *

* এইখানে প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক আমিয়েলের দৈনন্দিন লিপি

ভারতবর্ষের হৃদয়ে মনুষ্যত্ব অনেকাংশে সেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ বোধ হয় ভারতবর্ষের

---

হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহার মধ্যে বড় একটি সার কথা আছে। জন্তুদের প্রতি অবিচার ক্রমে যে মানুষ পর্য্যন্ত উঠে ইহা একটি চিন্তনীয় বিষয়।

6th October, 1866.—I have just picked up on the stairs a little yellowish cat, ugly and pitiable. Now curled up in a chair at my side, he seems perfectly happy, and as if he wanted nothing more. Far from being wild, nothing will induce him to leave me, and he has followed me from room to room all day I have nothing at all that is eatable in the house, but what I have I give him—that is to say, a look and a caress—and that seems to be enough for him, at least for the moment. Small animals, small children, young lives, - they are all the same as far as the need of protection and of gentleness is concerned ... People have sometimes said to me that weak and feeble creatures are happy with me. Perhaps such a fact has to do with some special gift or beneficent force which flows from one when one is in the sympathetic state I have often a direct perception of such a force, but I am no ways proud of it, nor do I look upon it as anything belonging to me, but simply as a natural

ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম সর্ব্বলোকে সর্ব্বজীবে, দেবতা হইতে কীটাণু এবং কীটাণু হইতে অচেতন পরমাণু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেবতার

---

gift. It seems to me sometimes as though I could woo the birds to build in my beard as they do in the headgear of some cathedral saint! After all, this is the natural state and the true relation of man towards all inferior creatures. If man was what he ought to be he would be adored by the animals, of whom he is too often the capricious and sanguinary tyrant The legend of Saint Francis of Assisi is not so legendary as we think, and it is not so certain that it was the wild beasts who attacked man first . But to exaggerate nothing, let us leave on one side the beasts of prey, the carnivora, and those that live by rapine and slaughter How many other species are there, by thousands, and tens of thousands, who ask peace from us and with whom we persist in waging a brutal war? Our race is by far the most destructive, the most hurtful, and the most formidable, of all the species of the planet. It has even invented for its own use the right of the strongest,—a divine right which quiets its conscience in the face of the conquered and the oppressed, we have outlawed all that lives except ourselves. Revolting and manifest abuse, notori-

অধিষ্ঠান উপলব্ধি করে। এবং সর্ব্বত্রই দেবতার অধিষ্ঠান জানিয়া সর্ব্ববিশ্বকে প্রীতি করিয়া সেই দেবতাকেই প্রীতি

---

ous and contemptible breach of the law of justice! The bad faith and hypocrisy of it are renewed on a small scale by all successful usurpers We are always making God our accomplice, that so we may legalise our own iniquities Every successful massacre is consecrated by a Te Deum, and the clergy have never been wanting in benedictions for any victorious enormity. So that what, in the beginning was the relation of man to the animal becomes that of people to people and man to man

If so, we have before us an expiation too seldom noticed but altogether just All crime must be expiated, and slavery is the repetition among men of the sufferings brutally imposed by man upon other living beings, it is the theory bearing its fruits —The right of man over the animals seems to me to cease with the need of defence and of subsistence So that all unnecessary murder and torture are cowardice and even crime The animal renders a service of utility: man in return owes it a need of protection and of kindness In a word, the animal has claims on man, and the man has duties to the animal.—Buddhism.

করে। সুতরাং তাহার অন্তরে হিংসা ও অপ্রীতি স্বভাবতই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। এবং পশু পক্ষী সচেতন হইয়া মনুষ্যত্বের সহবাস লাভ করে। সেই জন্যই বৈষ্ণব কবির গান—

আজু বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা আনন্দে হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই।
ধেনু না দেখিয়া বনে চকিত রাখালগণে
শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।
কানাই বলিছে ভাই খেলা ভাঙ্গা হবে নাই
আনিব গোধন বেণুরবে।
সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বর।
ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্ব রব করি
দাঁড়াইলা কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যাম অঙ্গ চাটে।

---

no doubt, exaggerates this truth,* but the Westerns leave it out of count altogether. A day will come, however, when our standard will be higher, our humanity more exacting, than it is to-day. *Homo homini lupus* said Hobbes ; the time will come when man will be humane even for the wolf—*homo lupo homo*.

দেখি সব সখাগণ আবা আবা ঘনঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলী শুনি
পশু পাখী পাইল চেতন।

এবং সেইজন্যই এই চেতনালব্ধ সর্ব্বজীবের তৃপ্ত্যর্থে সর্ব্ববিশ্বের উদ্দেশে ভারতবর্ষ প্রতিদিন তর্পণ করিয়া থাকে—

দেবা যক্ষাস্তথা নাগাঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জৃম্ভগা খগাঃ
বিদ্যাধরা জলধরাস্তথৈবাকাশগামিনঃ
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।

---

# কাব্যে প্রকৃতি।

শেক্ষপীয়রের নাটক পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হয় যে, শেক্ষপীয়র সমস্ত হৃদয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসিলেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার সামাজিকতা বড় নাই। এবং তাঁহার নাটকে নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনাবলীর উপর প্রকৃতির যে প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহা কেবল ছায়ার মত চতুর্দ্দিকের মানবহৃদয়ে ও ঘটনার উপরে ঘনাইয়া আসে মাত্র, কিন্তু সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যের ন্যায় প্রকৃতি সেখানে মানবজীবনের সহিত বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া মানবহৃদয়ের সহমর্ম্মিণী সঙ্গিনী হইয়া উঠে

নাই, এবং মানবী সখীর সুখে- দুঃখে মানবীর ন্যায় সে বিচলিত হয় না বা মানবীর বিরহে একান্ত সন্তপ্ত ও মিলনে অতিমাত্র হৃষ্টও হয় না।

যেখানে সমগ্র নাটকটিকে শেক্ষপীয়র লোকালয় হইতে বহুদূরে এক জনহীন দ্বীপে লইয়া ফেলিয়াছেন, সেখানেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার পারিবারিক প্রীতি সংস্থাপিত হয় নাই — প্রকৃতির অনেকগুলি দানবী শক্তি যেখানে নির্ব্বিবাদে আধিপত্য করিতেছিল সেইখানে তিনি এক মহামহিম মানব-প্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। এই মানব প্রভু প্রস্পেরোকে বগু শক্তি আরিয়েল ও ক্যালিবান যমের মত ভয় করিয়া চলে এবং যদি কালক্রমে এই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আপন স্বাধীনতা ফিরিয়া পায় এই আশায় দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রস্পেরো অথবা মিরান্দার সহিত 'এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির কাহারও কোনরূপ সমকক্ষতা নাই এবং বহুদিন একত্র বাসে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতাও জন্মে নাই। কেবল, প্রস্পেরো আদেশ করেন, আরিয়েল ও ক্যালিবান্ -প্রকৃতির দুই বিভিন্ন শক্তি— স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই আদেশ পালন করে। প্রস্পেরো বলেন, ঝড় উঠাও; প্রকৃতির সমস্ত শক্তি সাগরে তরঙ্গ তুলে, আকাশে বজ্রধ্বনি করে, পৃথিবীতে প্রলয়ের রোল উঠাইয়া দেয়। প্রস্পেরো বলেন, এই চাহি — দাসেরা তাহাই সংসাধন করে। শেক্ষপীয়রে প্রকৃতির উপর মানব

জয়ী হইয়াছে— প্রকৃতির উপর সে কর্ত্তৃত্ব করে, প্রকৃতির সহিত ঘর করে না।

কিন্তু সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যে প্রকৃতি মানবের সহিত সমান আসন পাইয়াছে এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতিতে উভয়ের মধ্যে একটি সুমধুর গার্হস্থ্য বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছে। ভবভূতির নাটকে তমসা মুরলা বাসন্তী প্রভৃতি নদনদী ও আরণ্য প্রকৃতি সীতার দুঃখে যেরূপ সমবেদনা অনুভব করিয়াছে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে যেরূপে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে তাহা শেক্ষপীয়রে নিতান্ত দুর্লভ। রাম যখন বনে আসিলেন, তখন সীতার দুঃখরজনী অবসান আশায় সেই গোদাবরীপ্রদেশের বন্য প্রকৃতি কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিল! পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দর বিলোলকবরী মূর্ত্তিমতী করুণা বা শরীরিণী বিরহব্যথার ন্যায় জানকীর বর্ণনায় তমসার কত প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে! বাসন্তী রামকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ছত্রে ছত্রে সীতার প্রতি তাঁহার কি গভীর সহানুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে। এমন শুশ্রূষাপরায়ণা সান্ত্বনাদায়িনী প্রকৃতি ইংরাজি নাটকে কোথায়? এই প্রেমে করুণায় শুশ্রূষাপরায়ণতায় উত্তরচরিতের প্রকৃতি দেবী হইয়া উঠিয়াছে।

কালিদাসের নাটকেও প্রকৃতি এইরূপ মানবেরই সখী। শকুন্তলার সখিগণের নাম করিতে হইলে প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার সহিত সেই মালিনীতীরস্থা শ্যামলা প্রকৃতিরও উল্লেখ করিতে

হয়। তপোবনের প্রতি তরুলতার সহিত শকুন্তলার সোদর স্নেহের সম্বন্ধ। এবং শকুন্তলার বিদায়কালে প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার চক্ষু যেমন জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, অসহায় হরিণশিশু যেমন অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে বারবার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তপোবনের এই পল্লবিত প্রকৃতিও সেইরূপ অশ্রুছলছল নতনেত্রে আপন নির্ব্বাক্ বেদনা জানাইয়া শাখাবাহু দ্বারা প্রিয়সখীকে বুকভরা আলিঙ্গন দিয়াছিল।

শকুন্তলায় এই প্রকৃতি নাটকের মেরুদণ্ড। মানবী সখী যখন শকুন্তলার বল্কল-বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, প্রকৃতি তখন কুরবকশাখায় বল্কল আট্‌কাইয়া দিয়া মানবী সখীর সহিত সেই প্রণয়ব্যাপার ঘনাইয়া আনে। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমকে তপোবনের এই রমণীয় প্রকৃতি যেন ভরাট্ করিয়াছে। এই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে শকুন্তলার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—দুষ্মন্ত শকুন্তলা প্রিয়ম্বদা অনসূয়া কণ্ব গৌতমী সমস্ত মিলিয়া একটি নির্জ্জীব মানবস্তূপ পড়িয়া থাকে মাত্র—এবং কালিদাসের প্রেম সহসা অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক বলিয়া মনে হয়।

কেবলি শকুন্তলায় নহে, কুমারসম্ভবে যেখানে মহাদেবের প্রতি মদন বাণ উদ্যত করিয়াছে সেখানেও সমস্ত প্রকৃতি অনুকূল ভাবে পূর্ণ হইয়া হরপার্ব্বতীর প্রেমকে সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ করিয়াছে। কালিদাসে মানবপ্রেম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ

নহে—চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার উপরে প্রকৃতি ঘনাইয়া আসিয়া সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ করে। এই জন্ত যোগীজনবিচরিত তপোবনেই তাঁহার প্রেম সম্পূর্ণ সফল হয়—যেখানে আরণ্য প্রকৃতি মানবের স্নেহে সিঞ্চিত হইয়া কোমল ও মধুর হইয়া আসিয়াছে এবং মানব-হৃদয় নাগরিকতা পরিহারপূর্ব্বক আরণ্য শ্যামলতায় সরস হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, সিংহ মৃগশিশুকে হত্যা করে না, মৃগশিশু মানবের পদপ্রান্তে বসিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নীবার রোমন্থ করে, এবং সর্ব্ব লোক সর্ব্ব জীব চেতন অচেতন জড় সকলের মধ্যে একটি প্রীতিশুভ্র পারিবারিকতা সংস্থাপিত হয়।

শেক্ষপীয়রে প্রেমের সহিত প্রকৃতির এত ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় না। সেখানে সুখসুপ্ত চন্দ্রালোকে প্রণয়ীযুগলের মনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের বহু প্রণয়কাহিনী আসিয়া উদয় হয় এবং পুরাতন কালের সমস্ত প্রেম এই নবীন প্রেমে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। এবং এইরূপে যুগযুগান্তের মানবপ্রেম আসিয়া মানবকে আপনার মহিমায় অধিকতর ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু প্রকৃতি সেখানে মানবের সখীরূপে ফুটে না হয়, ছায়ার মত, নয়, মানবের আজ্ঞাধীন সেবকরূপে অবস্থিতি করে। যেমন, মার্চ্যাণ্ট অফ্ ভেনিসে লোরেঞ্জো ও জেসিকার প্রণয়দৃশ্যে, অথবা টেম্পেষ্টে ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয়ঘটনায়।

সংস্কৃত কবিরা প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখেন। সেই জন্তই সংস্কৃত নাটকে প্রকৃতি মানবের সহকারিণী সখী। ভবভূতির

নিকট তিনি শুশ্রূষাপরায়ণা গম্ভীরহৃদয়া, এবং কালিদাসের নিকট তিনি সুন্দরী। কালিদাস নারীকে সৌন্দর্য্যেই সম্যক্ দেখিয়াছেন—প্রকৃতিকেও তিনি এই ভাবেই উপভোগ করেন।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপভোগে আধুনিক কবিদিগের সহিত কালিদাসের অনেক প্রভেদ। সেকালের কবি যেমন রমণীকে, অল্প হউক্ অধিক হউক্, পুরুষের ভোগ্যা বলিয়া জানিতেন, প্রকৃতিকেও কতকটা সেই ভাবেই দেখিয়াছেন। সেই জন্য কালিদাস যখন প্রিয়াসহ সুরম্য হর্ম্মামধ্যে দীর্ঘ বর্ষ যাপন করেন, ছয় ঋতু আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন মদিরা দিয়া তাঁহার পাত্র ভরিয়া দেয় এবং সুন্দরী দাসীর ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করে।

ভবভূতিতে যে, প্রকৃতি দেবী হইয়া উঠিয়াছেন তাহার কারণ এই যে, ভবভূতির প্রকৃতি জননীর ন্যায় শুশ্রূষাপরায়ণা ও কল্যাণদায়িনী। আমাদের দেশে নারী সৌন্দর্য্যে পূজিতা নহেন; জননী ও সতীরূপে গৃহের কল্যাণ ও আনন্দরূপেই তিনি এদেশের পূজা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। প্রকৃতিও যখন আমাদের নিকট এই ভাবে প্রতিভাত হয় তখনই আমরা তাহাকে দেবী করিয়া তুলি।

য়ুরোপে শিভেল্‌রি নারীকে অন্যরূপে দেখিয়াছে। সেখানে কবিদিগের রচনায় যে সৌন্দর্য্যের পূজা প্রচারিত হইয়াছে সে সৌন্দর্য্য কেবল ইন্দ্রিয়মাত্রের দ্বারা উপভোগ্য নহে। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরে যে সৌন্দর্য্যশক্তি নিহিত আছে নারীসৌন্দর্য্যে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট বলিয়া নারীপূজায়

সেই সৌন্দর্য্যেরই পূজা করা হয়। এবং এই সৌন্দর্য্যপূজা নারী হইতে ক্রমে সমস্ত প্রকৃতিতে যেন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক কবি এই সৌন্দর্য্যশক্তিকে অদৃশ্য প্রভাবের মত অনুভব করেন। বসন্তের বাতাস যেমন চঞ্চল পক্ষে ফুলে ফুলে নিশ্বাস ফেলিয়া বহিয়া যায়, এই অদৃশ্য প্রভাবের ছায়াও সেইরূপ সর্ব্ববিশ্বের উপর দিয়া—লোক-লোকান্তর স্পর্শ করিয়া—প্রবাহিত হয়। এই অদৃশ্য প্রভাব—এই ছায়া—শুধু সঙ্গীতের স্মৃতির মত—অত্যন্ত রহস্যময়, কিন্তু এই রহস্য-বশতই প্রিয়তর। এই সৌন্দর্য্যের মূলশক্তি, বাহ্য প্রকৃতিতে, মানবহৃদয়ে, প্রেমে, আশায়, স্বপ্নে, সর্ব্বত্র ছায়া ফেলিয়াছে। কবি এই চরাচরপ্লাবী সৌন্দর্য্যরহস্যে নিমগ্ন হইয়া দেখিতেছেন যে, এই সমস্তই সেই মহাসৌন্দর্য্যে ওতপ্রোত, এবং এই সৌন্দর্য্য অবলম্বন করিয়াই মানবের অন্তরের সহিত প্রকৃতির অন্তরের অনির্ব্বচনীয় যোগসূত্র নিবদ্ধ রহিয়াছে।

সৌন্দর্য্যের এই অদ্বৈতবাদই আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতার মর্ম্মস্থল। ইহাকে অদ্বৈতবাদ না বলিয়া ঐক্যবাদ বলা উচিত। সমস্ত চরাচর চেতন অচেতনের মধ্যে যে একমাত্র মহীয়সী সৌন্দর্য্যশক্তি উদ্ভাসিত ইহাতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।—

এই অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি দ্বারা সমস্ত খণ্ড জগৎ একটি সর্ব্বব্যাপী সুমধুর মিলনে আবদ্ধ হইয়া একটি অখণ্ড সঙ্গীতের ন্যায় বৃহৎ এবং এক হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতের

বিচ্ছিন্ন সুরগুলি স্বতন্ত্র ভাবেও শ্রুতিমনোহর হইতে পারে, কিন্তু যখন তাহাদের মধ্যে আদ্যোপান্ত একটি অবিভক্ত সৌন্দর্য্য একটি মহা-রাগিণীর সমগ্রতা আবিষ্কার করা যায় তখন আনন্দ সুনিবিড় হইয়া উঠে এবং একটি বিপুল রহস্তময় পুলকে সমস্ত অন্তরাত্মা চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের ন্যায় আন্দোলিত হইতে থাকে। প্রাচীন কাব্যে প্রকৃতি কোথাও এরূপ সম্মিলিত সমতানে অনাদ্যন্ত নভস্তল হইতে মানবের অন্তর-গুহা পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। সেখানে খণ্ড প্রকৃতি—খণ্ড সৌন্দর্য্য—মানবের সাহচর্য্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এক বিশ্বব্যাপিনী মহীয়সী সত্তা মানবাত্মাকে চরাচরের সহিত সৌন্দর্য্যপুষ্পমাল্যে আবদ্ধ করিয়া মহীয়ান্ করে নাই।

কেবল আমাদের প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থে, বেদে, এই মহা-সঙ্গীত উদ্গীত হইয়াছে। তেমন সহজে তেমন সতেজে তেমন সংক্ষেপে আর কোন দেশের কোন কাব্যে জগতের এই রহস্যবার্ত্তা প্রচারিত হয় নাই। ঋষিরা বলিয়াছেন—

*আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,*
*আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,*
*আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।*

আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণী জন্মলাভ করিয়াছে, আনন্দের দ্বারাই সমস্ত প্রাণী জীবিত রহিয়াছে এবং আনন্দের অভিমুখেই প্রবেশ করিতেছে।

ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে সকল কথাই বলা হইয়াছে। সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত সুখ, সমস্ত চেতনা, সমস্ত প্রাণ এক অনাদি অনন্ত মহানন্দের দ্বারা সন্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—সেই জগচ্চরাচরের জগদতীত আনন্দ-ঐক্য যে মহাত্মা অনুভব করিতে পারিয়াছেন তিনি আর

> ন বিভেতি কুতশ্চন,
> ন বিভেতি কদাচন।

---

# রবিবর্ম্মা।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে সাহিত্যের যেরূপ অনুশীলন হইয়াছে, কলাবিদ্যার অন্যান্য অঙ্গের তাহার শতাংশের একাংশও আদর হয় নাই। বিশেষতঃ চিত্রকলা এদেশে তাহার সেই আদিম রঙ্‌লেপা বর্ব্বর অবস্থা হইতে অল্পই অগ্রসর হইয়াছে। ইংরাজিশিক্ষিতদের নিকট র‍্যাফেল টিশিয়ান প্রভৃতি বড় বড় পাশ্চাত্য চিত্রকরদিগের বৃত্তান্ত অবিদিত নাই এবং কাহারও কাহারও ভাগ্যে ঐ সকল চিত্রশিল্পীদিগের রচনা দর্শনও ঘটিয়াছে, কিন্তু র‍্যাফেল টিশি-য়ানের মাহাত্ম্য অনুভব অপেক্ষা অনুমানের দ্বারাই আমরা প্রধানতঃ আয়ত্ত করি। এক ত আমাদের দেশে চিত্রশিল্পের

তাদৃশ অনুশীলন অভাবে আমাদের চিত্রসৌন্দর্য্য উপভোগের বৃত্তিগুলিই সম্যক্ উন্মেষিত হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ য়ুরোপীয় চিত্রশিল্পে আমাদের ভাবের, দেশীয় কল্পনার, পৌরাণিক সৌন্দর্য্যের কোনরূপ বিকাশ লক্ষিত হয় না—সুতরাং তাহা তেমন সহজে অবিলম্বে আমাদের অন্তরের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে না। সেইজন্য, পৌরাণিকী কল্পনাকে তুলিকার স্পর্শে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিতে পারেন আমাদের মধ্যে এইরূপ এক প্রতিভার আবশ্যক হইয়াছে। ভাষায় যাহা কতকটা বর্ণনায় কতকটা আভাসে, কতকটা লেখকের রচনায় কতকটা পাঠকের মনে মনে গঠিত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সেই সুন্দর ভাবগুলিকে সমগ্রভাবে—যে অংশ ব্যক্ত ও যে অংশ অস্ফুট মিলাইয়া—রেখায় রেখায় অনুবাদ করিতে হইবে। এই নব চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার ইহাই কার্য্য।

আমাদের কলিকাতার আর্ট-ষ্টুডিয়ো কতকটা এই ভাবেই পরিচালিত বোধ হয়। কিন্তু আর্ট-ষ্টুডিয়ো হইতে বৎসর বৎসর যে সকল পৌরাণিক চিত্রাবলী বাহির হয় কালীঘাটের পয়সা পয়সা পটের সহিত—কাগজের উৎকর্ষতা ও বর্ণবৈচিত্র্যের অধিকতর ঘনঘটা ভিন্ন—তাহার প্রভেদ অল্পই, এবং তাহা দেখিয়া মনে বড় আশার সঞ্চার হয় না। কারণ, ঐ সকল বিচিত্রবর্ণ চিত্রে কোথাও কোনও ভাবের বিকাশ হয় নাই, শরীরের কোনরূপ গঠনপারিপাট্য প্রকাশ পায় নাই, এবং বর্ণবিন্যাসে সৌন্দর্য্য-বোধ আভাসেও আপনাকে

ধারু করে নাই। করাল কালিকার ভীষণ-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া মন কোথায় ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে, না, আর্ট-ষ্টুডিয়োর চিত্র মনে কেবল একটা ভাববিহীন কুৎসিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মূর্ত্তি স্থাপনা করে এবং তাহাতে বিরক্তি ভিন্ন মনে কোনপ্রকার সাধুভাবের সঞ্চার হয় না। সরস্বতীর মুখে চোখে প্রতিভার দীপ্তি দেখিয়া হৃদয় কোথায় পরি-পূর্ণ হইয়া উঠিবে, না, আর্ট-ষ্টুডিয়োর চিত্রকর বহু পরিশ্রমে সকল ভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক একটি অতি নির্ব্বোধবৎ নিষ্প্রভ মুখমণ্ডল রচনা করিয়াছেন—সকল কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত তাঁহাদের যে সপ্ত জন্মে মুখ-দেখাদেখি নাই তাহাতে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। চৈতন্যের দারুণ পীতকান্তি চিত্র দেখিলে ধারণা জন্মে যে, চিত্রকরের দৃষ্টিপথে যকৃৎ-রোগী ভিন্ন কখনও কোনও সুস্থদেহ মনুষ্যবংশীয় পতিত হয় নাই; এবং তাঁহার নেত্রনীরপতন দেখিলে মনে হয়, মস্তকমুণ্ডনের ন্যায় চক্ষে ক্ষীবলেপনও বুঝি নবদ্বীপে এক-সময়ে ফেসান ছিল এবং আবশ্যকমত সভাস্থলে বৈষ্ণবদিগের চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু তাহাই ঝরিত। সুতরাং আর্ট-ষ্টুডি-য়োর উদ্দেশ্য সাধু হইলেও দুঃখের সহিত তাহার ভরসা ছাড়িতে হয়।

দাক্ষিণাত্য এবিষয়ে বঙ্গদেশ অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী। সেখানে ঠিক যাহা আবশ্যক তাহাই মিলিয়াছে—সভা নহে, সমিতি নহে, কোম্পানী নহে, কলিকাতার মত আর্ট-ষ্টুডিয়ো

নহে—একটি যথার্থ চিত্রকরী প্রতিভা, যে কেবল কাপি না করিয়া সৌন্দর্য্য অনুভব ও প্রকাশ করিতে পারে, যে মধুপের মত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া গিয়া সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়া আনে এবং সেই সৌন্দর্য্যের চাক বাঁধিয়া চিত্ত হরণ করিতে জানে। এই প্রতিভা রবিবর্ম্মা। তিনি পৌরাণিক এবং অন্যান্য নানাবিষয়ক অনেকগুলি চিত্র রচনা করিয়াছেন। এবং এই সকল চিত্রে তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ ও রসগ্রাহিতার বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণা নায়ার রূপসীর চিত্র, শ্যামাঙ্গী গোপাঙ্গনার সুডোল নিটোল গঠন ও নয়ন ও অধরের ভাব, লালা রুখ্, রামসীতার পরিণয়, বা সুভদ্রার্জ্জুনের প্রণয়দৃশ্য কাহার না চিত্ত হরণ করে? তাঁহার শান্তনুর নিকট হইতে পুত্রসহ গঙ্গার পলায়ন, বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গার্থে প্রেষিত মেনকা, শান্তনুর প্রশ্নজিজ্ঞাসায় সরলা সত্যবতীর সলজ্জ অথচ মুক্ত অকপট ভাব, কোন্‌টি না সুন্দর? যশোদার গোদোহন ও হৃষ্টপুষ্ট গোপালের চিত্র, পূতনাবধান্তে মঙ্গলাচরণকালে শিশু নন্দদুলালের ভাবমাধুর্য্য, এবং কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ হইতে গিয়া রাধিকাকে প্রেমভরে আক্রমণ, কোন্‌টিতে না আমাদের অন্তরে একটি পৌরাণিক আনন্দ সঞ্চার করিয়া দেয়? হয়ত ইহার মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি থাকিলেও থাকিতে পারে যাহা আর্টসমালোচক ভিন্ন অপরের চক্ষে প্রতিভাত হয় না—এবং এই বাঙ্গালা দেশের আর্ট-ষ্টুডিয়ো ও কালীঘাটের পটের চতুঃ-

সীমা মধ্যে বর্দ্ধিত আমাদের সে সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র—কিন্তু চিত্রগুলির মধ্যে যে একটি মনোহর ভাব আছে এবং সেই ভাবটুকু ভারতবর্ষের অন্তরতম হৃদয় মথিত হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। পৌরাণিক চিত্র এমন সুন্দর ভাবে এদেশে ইতিপূর্ব্বে কখনও অঙ্কিত হয় নাই। এবং খুঁটিনাটি ত্রুটি থাকিলেও রবিবর্ম্মাই এদেশের প্রথম প্রতিভাশালী চিত্রকর।

রামসীতার পরিণয়চিত্রটি তিনি কি সুন্দরই আঁকিয়াছেন! রাম তখন বালকমাত্র এবং সীতা বালিকা—ঈষৎ উন্মেষিত সুকুমার কুসুমকোরকবৎ দুইখানি কচি মুখ, তাহাতে যে কি পুণ্য মাধুরী তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। রামচন্দ্রের দক্ষিণ পাণিমধ্যে সীতার নবনীসুকোমল পাণিতল সমর্পিত; এবং সেই স্বভাববিনম্র মুখে ও চারু আনত নেত্রে একটি অনির্ব্বচনীয় মহিমা দীপ্তি পাইতেছে। তাতগণ ও মাতৃকুলের দৃষ্টিতে কি স্নেহ। সমস্ত পরিজন ও অনুচরবর্গের মুখে কি ভাব। এমন বিবাহ বুঝি পৃথিবীতে আর কখনও ঘটে নাই।

তখন কে জানিত, এই শুভ উৎসবদিনের কি পরিণাম! কে জানিত, এই মূর্ত্তিমতী আনন্দের কপালে কত দুঃখ আছে' রাজার নন্দিনী, রাজার বধূ হইয়া বনে বনেই তাঁহার চিরদিন কাটিবে কে মনে করিয়াছিল! রাক্ষস হরণ করিল, স্বামী বনবাস দিলেন, পরীক্ষার পর পরীক্ষা; নারীর কোমল

হৃদয়ে এত সহে না। সভামধ্যে দাঁড়াইয়া পতিব্রতা ডাকিলেন, বসুন্ধরে, বিদীর্ণ হও ; রসাতল ভেদ করিয়া স্নেহময়ী ধরিত্রী আপনি বাহির হইয়া আসিলেন ; বলিলেন, আয় মা আয়, তুই আমার রাণী, আমার কোলে আয়।—রাখ রাখ, ফির ফির।—কে ফিরিবে? জননী আপন বক্ষে বাঁধিয়া সীতাকে লইয়া গেলেন।

রবিবর্ম্মার এই পাতালপ্রবেশটিও সুন্দর চিত্র। পরিণয়-চিত্রের সমকক্ষ না হইলেও লক্ষ্মণের অশ্রুম্লান অধোবদন, রামের উদ্বেল ব্যাকুলতা, কুশলবের ভয়বিস্ময়বেদনাবিমিশ্রিত ভাব, রামের প্রতি সীতার সকরুণ বদ্ধদৃষ্টি, ধরিত্রীর বিষাদঘন মুখ, সমস্ত মিলিয়া পাতালপ্রবেশ দৃশ্যে একটি মনোহর যাথার্থ্য অর্পণ করিয়াছে।

কিন্তু অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রেমচিত্রের মত ভাবের গৌরব বুঝি কোনটিতেই নাই। সুভদ্রা ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া, দক্ষিণ করতল প্রস্তরবেদীর উপরে রক্ষিত, শাড়ীর কোঁচার ভাঁজে ভাঁজে ছায়া আলোকের খেলা, খোপায় ফুলের মালা, ললাটে টিপ, আনত নেত্রপল্লবে স্ত্রীর আবেশ ও চারু অধর-পুটে শুভ্র হাসির মত মৃদু লজ্জা। অর্জ্জুন স্বীয় দক্ষিণ করে সুভদ্রার বাম হস্ত ধারণ করিয়াছেন এবং অপর হস্তে সুমধুর স্নেহভরে সুভদ্রাকে প্রায় বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছেন—যেন পুরুষহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ প্রেম করুণা ঐ বাহুপাশে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রশস্ত ললাটে উদার দীপ্তি, নয়নে নিবিষ্ট

প্রেম, সুগঠিত অধরপ্রান্তে সুসংযত স্মিতমাধুরী এবং ঈষৎ আনমিত অর্দ্ধবেষ্টনে একটি পরম শরণ ভাব।

এই প্রণয়দৃশ্যে সংযমী অর্জ্জুনের চরিত্রগৌরব যেন সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছে—সেই গভীর হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, সেই করুণ হৃদয়ের সমস্ত করুণা, সেই নির্ভীক স্বভাবের ত্রিভুবনবিজয়ী তেজস্বিতা এবং সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অবিচলিত ধী। আলঙ্কারিকদিগের মতে মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য হইলেও, অর্জ্জুনের চরিত্র এই সকল গুণে সকল পাণ্ডবদিগের মধ্যে সমধিক উজ্জ্বল। অর্জ্জুনের পার্শ্বে যুধিষ্ঠির অতি মৃদু। হয়ত নীতিবিধান অনুসারে তাঁহার প্রেম অর্জ্জুনের ভালবাসা হইতেও উচ্চতর—কারণ, দ্রৌপদীই তাঁহার একমাত্র প্রেয়সী এবং রূপসীর সমস্ত অনাবৃত সৌন্দর্য্য হয়ত তাঁহাকে বিচলিত করে না, কিন্তু সে অটল নীতিও নারীর হৃদয় তেমন আকর্ষণ করিতে পারে না, অর্জ্জুনের প্রেমদৃষ্টিতে তাহা যেমন সহজে আকৃষ্ট হয়। যুধিষ্ঠিরের অস্খলিতপদ সংসারযাত্রা প্রবীণদিগের দুর্লভ প্রশংসা আকর্ষণ করে; কিন্তু অর্জ্জুনের সংস্পর্শ যেমন হৃদয় হইতে হৃদয়ে তড়িৎ সঞ্চার করিয়া দেয়, তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রানুসারী ধীরতা হৃদয়ে সে উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিতে পারে না। অর্জ্জুনের চরিত্রে মানবপ্রকৃতির অনেকগুলি বিভিন্ন ভাবের সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে; তাঁহার দয়া এত যে, শত্রুকে বধ করিতেও অন্তরে ব্যথা লাগে, আবার তেজ এমনি যে, গাণ্ডীবের সামান্য

নিন্দামাত্রও সহে না; যুধিষ্ঠিরের মত অবিচলিত ধীরতার সহিত সকল সহ্য করিতে তিনি অক্ষম, ভীমের মত বৈর-নির্যাতনে তাঁহার একটা বর্ব্বর উল্লাসও নাই। সবশুদ্ধ তাঁহার চরিত্রে প্রতিভার এমন একটি মহিমা আছে, ভাবে এমন একটি অবলীলাসুশোভনতা আছে যাহাতে তিনি হৃদয়ের অত্যন্ত নিকট হইয়া উঠেন। এবং রবিবর্ম্মার চিত্রে তাঁহার এই সংযত গম্ভীর প্রসন্ন সুরসিক আবেগপূর্ণ সুন্দর ভাবটি অতি সুন্দররূপে ফুটিয়াছে।

মহাভারতীয় বিষয় লইয়া রবিবর্ম্মা অনেকগুলি চিত্র আঁকিয়াছেন—কাচকমন্দিরে সৈবন্ধ্রী, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নলদময়ন্তী, শকুন্তলার লিপিরচনা, আরও গুটিকতক আছে, কিন্তু অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রণয়দৃশ্যে অর্জ্জুন যেমন কেবলমাত্র প্রণয়ীরূপে নহে কিন্তু তাঁহার চরিত্রের সম্পূর্ণ গৌরবে ফুটিয়াছেন, অন্য চিত্রগুলি ভাল হইলেও কোন চরিত্রকে তেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে কি না সন্দেহ। হয়ত সে সকল চরিত্রের গৌরবও অর্জ্জুনের সমকক্ষ নহে। এবং এত করিয়া ফুটাইবার আবশ্যকও হয় নাই।

নলদময়ন্তী উপাখ্যানের প্রধান চিত্র কলির প্রভাবে ধীর-স্বভাব নল প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে কিরূপে ত্যাগ করিয়া যান। নলের সমস্ত চরিত্রের সহিত ইহার বড় সম্পর্ক নাই। সেই অন্ধকার বনমধ্যে বাহুপরি নিদ্রিতা দময়ন্তীর চিত্র এবং অর্দ্ধ-বাস ছিন্ন করিয়া পলায়নোদ্যত রাজা নলের কলিপ্রবিষ্ট ভাবটি

ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই দর্শকের মনে উপাখ্যানটি নিঃশঙ্কে সম্পূর্ণ হইয়া আসে এবং দময়ন্তীর দুঃখে হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠে। রবিবর্ম্মা তাহা ঠিক ধরিয়াছেন এবং সেই অন্ধকার দৃশ্যপটে এই শোচনীয় ঘটনাটি এমনি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন যে, তাহা বুঝিতে কালবিলম্ব হয় না।

হিমালয়ের পাদদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি বসিয়া ললাটস্তপবদ্ধদৃষ্টি বিশ্বামিত্র একাগ্রমনে তপস্যা করিতেছেন; অদূরে স্বচ্ছ শ্বেতধারায় পর্ব্বতের গাত্র ধৌত করিয়া বেগবতী নির্ঝরিণী গম্ভীর নিনাদে অবিরাম ঝরিতেছে। এই মনোহর শৈলদৃশ্যের মধ্যে মেনকা রূপযৌবনমাধুর্য্যচেষ্টিতস্মিতভাষিতের দ্বারা বিশ্বামিত্রের মনোহরণ করিতে আসিয়াছেন। মুখে কোনরূপ চাপল্য নাই, মোহাবেশী কৃষ্ণতারক নেত্রযুগলে একটি স্নিগ্ধ মৃদু গাঢ়তা,বিশ্বামিত্রের পার্শ্বে বসিয়া কত সকরুণ দৃষ্টিতে যেন তাঁহার ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন কোমল, এমন করুণ, এমন উজ্জ্বল মধুর কমনীয় ভাব। বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্যই যেন এ রূপ সৃষ্ট হইয়াছে।

বাস্তবিক রবিবর্ম্মা পৌরাণিক ভাবগুলির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন; সেই জন্যই চিত্রে তিনি এমন সুন্দর ভাববিকাশ করিতে পারেন। তাঁহার কীচকমন্দিরে প্রেরিত সৈরন্ধ্রীর মুখে রমণীজনোচিত ভীতিভাবের সঙ্গে দেবতার উপরে কেমন অটল নির্ভর প্রকাশ পাইয়াছে। বস্ত্রহরণ চিত্রে তেজস্বিনীর পাণ্ডবদিগের প্রতি সাশ্রু তীব্রদৃষ্টি এবং

আত্মসম্ভ্রমরক্ষণে প্রাণপণচেষ্টা, পাণ্ডবদিগের প্রতিজনের ভিন্ন ভিন্ন মুখভাব, ধৃতরাষ্ট্রের নতশির, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের উল্লসিত গর্ব্ব, সকলই কেমন যথাযথ। আমরা এই সকল চিত্রে মহাভারতকারের সেই অতুল্য প্রতিভার ছায়া অনুভব করি।

কিন্তু শকুন্তলার লিপিরচনা চিত্রে চিত্রকর তপোবনের বিরহকৃশাঙ্গী শকুন্তলাকে আঁকিতে পারেন নাই। উন্মুক্ত বনচারিণী মৃগাঙ্গনার মত তাঁহার শরীরে সুন্দর সুকুমার লাঘবতা প্রকাশ পায় নাই; অন্তঃপুরপালিতা অতিপুষ্টা যুবতীর মত তাঁহার দেহখানি গুরুভারকাতর দেখাইতেছে। কালিদাসের শকুন্তলা মধুরাকৃতি ও তন্বী—এবং লতা ও কুসুমের সহিতই তাঁহার দেহ ও যৌবনের যাহা কিছু সাদৃশ্য। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে এই কৃশমধ্যা তন্বঙ্গীই রূপসীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সৌন্দর্য্যপিপাসা তখন মেদস্ফীত পীবর স্থাবরতার প্রতি ধাবিত হইত না এবং তুরস্ক প্রথানুসারে স্ত্রীগুলিকে বহুযত্নে ঘৃতনবনীক্ষীরসরের সাহায্যে পিণ্ডীকৃত করিয়া তোলা হইত না। এ আদর্শ এদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক—কতদিন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, বোধ হয় মুসলমান আমলের।

কিন্তু আমাদের এই দেশীয় চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়া প্রথম আনন্দের উচ্ছ্বাসে নিন্দার কথা আর মুখে আনিতে ইচ্ছা করে না। যখন ভারতবর্ষে অনেক চিত্রকরের অভ্যুদয় হইবে এবং আমাদের চিত্রসম্পদ অজস্র হইয়া উঠিবে

তখন আমরা সূক্ষ্ম বিচারের অধিকারী হইব। এখন যাহা পাওয়া যায় তাহাই পরম লাভ বলিয়া মনে হয়। চিত্রকলার কতটা দূর পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে তাহাও আমাদের জানা নাই। আমরা হয়ত বালকের মত আকাশের চাঁদ প্রত্যাশা করিয়া বসিব। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের চিত্রে আমরা ক্ষত্রতেজ ও ব্রহ্মতেজের যে সম্মিশ্রণ দেখিতে চাই তাহা হয়ত রেখায় ও বর্ণে প্রকাশ করা অসাধ্য। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্যে তেজস্বিনী অবমানিতা দ্রৌপদীর লজ্জা ক্রোধ অভিমান বিস্ময় একত্র পাইতে চাই; আমরা দেখিতে চাই, অপমানিত হইয়াও দ্রৌপদী আমাদের নিকট অপমানিত হইতেছেন না, বরঞ্চ প্রজ্বলিত তেজোরাশির দীপ্তিতে তিনি আমাদের চক্ষে আরও দ্বিগুণ মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছেন—কিন্তু এ সকল হয়ত আমাদের কল্পনার দুরাশা মাত্র।

যেখানে চিত্রের সহিত আমাদের কল্পনার বিরোধ উপস্থিত হয় সেখানেও আমরা একটা মহৎ ফললাভ করি। চিত্রকরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের চিত্ত নব উদ্যমে মানসপটে আপনার ভাবকে পরিস্ফুটতর করিয়া আঁকিতে চেষ্টা করে। যেটাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়, মনে মনে তুলি ধরিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিবার একটা প্রয়াস চলিতে থাকে—ইহাতেও আমাদের বড় একটি শিক্ষা ও আনন্দ লাভ হয়।

---

# হিন্দু দেবদেবীর চিত্র।

দেবতাপ্রিয় ভারতবর্ষীয় কল্পনা বহিঃপ্রকৃতি ও মানব-চরিত্রে যেখানে যে সৌন্দর্য্যটুকু অনুভব করিয়াছে তাহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট গঠন দিয়া নিঃশব্দে আপন দেবতা গড়িয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য ভারতবর্ষের পৌরাণিক দেবভূমিতে আসিয়া হৃদয় যেমন পরিতৃপ্ত হয় এমন আর কিছুতে নহে। গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্ত্তির অতুলনীয় দেহসৌন্দর্য্য হয়ত আমাদের দেবলোকে সর্ব্বত্র তেমন সুলভ নহে, কিন্তু এই সকল দেব-মূর্ত্তিতে আমাদের অন্তরের বহু গভীর আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের অনাবিল অন্তরতম অন্তর সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আমাদের সুখ দুঃখ, বেদনা আশা, সৌন্দর্য্য প্রেম, মোহ আকাঙ্ক্ষা সকলই এই দেবলোকে। যাহা কিছু মর্ত্ত্য—নিতান্তই ঐহিক—তাহাও আমরা মর্ত্ত্যলোকে সাহস করিয়া রাখিতে পারি নাই, দেবতাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাই যোগী শিবকে পার্ব্বতীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এই মর্ত্ত্য গার্হস্থ্যকে কৈলাসের অমরলোকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কন্দর্পকে কেবলমাত্র সামান্য নরনারীর হৃদয়বন্ধন না করিয়া হরপার্ব্বতীর চিরবন্ধনরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। যমুনাতীরের তমালছায়াসুপ্ত সুন্দর আহীর-পল্লীটিকে মানবের না রাখিয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ

করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে যুদ্ধ বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব কোলাহল, মান অভিমান, প্রণয় বিরহ যেমন যাহা ঘটে, দেবলোকে সকলই বজায় আছে; কেবল, এখানে মৃত্যু আছে, সেখানে মৃত্যু নাই। মৃত্যুও সেখানে অমর।

কিন্তু এই মৃত্যুই মর্ত্যের প্রধান সৌন্দর্য্য—পৃথিবীর সকল সুখদুঃখ বেদনা আনন্দের চরম পরিণাম। এই যে সকলি আছে অথচ সর্ব্বদাই হারাইবার ভয়, এই যে নশ্বরতা, ইহাতেই ইহলোকের সকল সুখদুঃখ নিহিত। দেবলোকে যদি এই মৃত্যুই না রহিল, তবে দেবতাদের সুখদুঃখের সহিত আমাদের সুখদুঃখের সম্বন্ধ কিসের? ভারতবর্ষীয় হৃদয় সুতরাং অমরধামেও মৃত্যুর ছায়া রচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সতীর দেহত্যাগে ও রতিপতির অনঙ্গীকরণে এই মৃত্যুরই অনুরূপ চিত্র সূচিত হইয়াছে।

এইরূপে সমস্ত মর্ত্য গুণাবলী দেবতায় আরোপিত হইয়া দেবলোকেই আমাদের অন্তর বিকাশ লাভ করিয়াছে। মানবের অতি তুচ্ছ সুখদুঃখ পর্য্যন্ত দেবতার। এবং বৃহৎ দেবলোক এই মর্ত্ত্যধামেরই একখানি সুন্দর চিত্র। এই গঙ্গাই সেখানে মন্দাকিনীরূপে চিরপ্রবাহিত; এবং এখানকার মলয়ানিলস্নিগ্ধ চূতমুকুলিত বসন্ত মন্মথের সখারূপে নিত্য বিকশিত। অপ্সরাগণ সেখানে জলক্রীড়া করে এবং চারু-অঙ্গসম্ভব যৌবন চতুর্দ্দিকে চিত্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে। মানবহৃদয় স্পর্শ করে না দেবরাজ্যে এমন কিছুই নাই।

সেই জন্যই ভারতবর্ষের সাধারণ্যে দেবদেবীর চিত্র যেরূপ সমাদৃত এমন আর কিছুই নহে। এবং চিত্রের দ্বারা আমাদের অন্তর স্পর্শ করিতে হইলে এই সকল চিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। শিব দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী, কৃষ্ণের বাল্য যৌবন বিবিধ লীলা, দেবলোকের নানাবিধ কাহিনী আমাদের সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে বহু যুগ ধরিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এবং মনে মনে আমরা এই সকল দৈব সৌন্দর্য্যের একটি অসম্পূর্ণ চিত্র গড়িয়া রাখিয়াছি। চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্যে এই অসম্পূর্ণ অপরিস্ফুট ভাব সৌন্দর্য্যে ও জীবনে পূর্ণ হইয়া উঠে।

দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশে ধর্ম্মচিত্রাবলী এ পর্য্যন্ত যাহা বাহির হইয়াছে তাহাতে হৃদয়ে সৌন্দর্য্য উন্মেষিত ত হয়ই না, বরঞ্চ অনেক সময় প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের সৌন্দর্য্যটুকু লুপ্ত হইয়া থাকে। দেবতার প্রাচীন আদর্শ আমাদের মনেও যে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ আছে তাহা নহে। সেনাপতি কার্ত্তিকেয় বঙ্গনারীর সন্তানকামনার দেবতা হইয়া অবধি ধীরে ধীরে বর্ম্ম ছাড়িয়া ধুতি চাদর ধরিয়াছেন এবং ময়ূরে চড়িয়া যখন বাহির হন তখন হিন্দুস্থানী কাঠিন্য সে দেহে কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। বাঙ্গলার চিত্রকর যদি এই অধুনাতন বঙ্গীয় ভাবে কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় বিচলিত হয়েন সে জন্য তাঁহাকে তত দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কার্ত্তিকেয়কে বাঙ্গালী করিয়া আঁকিলেও তাঁহার গঠন ও মুখশ্রীতে সৌন্দ-

র্যোর বিশেষ বিকাশ হওয়া আবশ্যক। কারণ, সংস্কৃত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও আমাদের মনে কার্ত্তিকেয়ের রূপের প্রতিষ্ঠা অটল।

কিন্তু বাঙ্গলার চিত্রশিল্পে রূপ যে কোথায় প্রচ্ছন্ন থাকে তাহা দেবতারাও জানেন না। সৌন্দর্য্য উন্মেষিত করিতে পারিলে স্থলবিশেষে প্রচলিত আদর্শের অনুসরণ করিয়াও চিত্রকর আপন গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেন। তাহাতেও ত বিশেষ একটা ভাবের বিকাশ থাকিত। এবং সেই ভাবের গুণে সংস্কৃত আদর্শ হইতে অল্পবিস্তর বিচ্যুতি কাহারও নিকট তেমন মারাত্মক বলিয়া বোধ হইত না। চিত্রকর যে ভাবেই চিত্রিত করুন, ভাবটি চিত্রে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে, এবং চিত্র যেন কোথাও অসঙ্গত না হয়।

কিন্তু সঙ্গতি বঙ্গীয় চিত্রাবলীতে কদাচ লক্ষিত হয়। মানবদেহের বর্ণ মানুষের মত না হওয়া, গঠনে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, এবং মুখশ্রীতে সকল ভাবের আত্যন্তিক অভাব ইহাই এখন আমাদের চিত্রশালার গৌরব। গৌরাঙ্গ পীতবর্ণ; কারণ, কাব্যে গৌর অঙ্গের সহিত তপ্তকাঞ্চনের সাদৃশ্য উল্লিখিত হইয়াছে এবং তপ্ত-কাঞ্চনে হরিদ্রার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। রাধার প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ যেন যুগ যুগ ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রাণপণে নীল পেন্সিল ঘষিয়াছেন, এবং এই বহু পেন্সিলঘর্ষণের ফলে কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকার হৃদয় নহে কিন্তু বাঙ্গলার রাধিকা-

গঞ্জন ধর্ম্মচিত্রকরদিগেরও হৃদয় মন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রণোন্মাদিনী শ্যামা এই অঙ্গারধূমোদগারী কলিযুগে মূর্ত্তিমতী রাণীগঞ্জগঞ্জিনী অবিশ্রাম আলকাতরা লেপন ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাও মানবশরীরে সে বর্ণের আভাস ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

কিন্তু এই অদ্ভুত বর্ণসঙ্গম চিত্রকরের দোষে ঘটিয়াছে অথবা সংস্কৃত আদর্শের দোষে? সংস্কৃত সাহিত্যে শ্যামা রাত্রির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা; এবং কৃষ্ণেরও বর্ণ মেঘের ন্যায়। সুতরাং মানবদেহে এই রাত্রি অথবা মেঘের বর্ণ ফুটাইতে হইলে চিত্রকর রাণীগঞ্জ নীল পেন্সিল প্রভৃতির শরণাপন্ন না হইয়া কি করেন? কিন্তু, সাহিত্যরসজ্ঞ মাত্রেই জানেন, উপমা সাদৃশ্যসূচক মাত্র। চন্দ্রবদন বলিলে কাহারও মনে একটি কলঙ্করেখালাঞ্ছিত দীপ্ত গোলাকার মুখমণ্ডল উদিত হয় না—মনে একটি প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যের ভাব উদ্রেক করে মাত্র। শ্যামার বর্ণ কালরাত্রির ন্যায় বলিলে সত্যসত্যই শ্যামা যে রাণীগঞ্জসম্ভবা এমন বুঝায় না—কেবল একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভীষণগম্ভীর সৌন্দর্য্যের আভাস দেওয়া হয়। কৃষ্ণেরও বর্ণ সেইরূপ বাস্তবিকই মেঘ নহে। এবং নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বর্ণও নবোদ্গত দূর্ব্বাহরিৎ নহে—নবদূর্ব্বার স্নিগ্ধশ্যাম লাবণ্যবিশিষ্ট বটে। মানবের বর্ণ কখনও মেঘ অথবা রাত্রি অথবা দূর্ব্বার মত হয়?

বর্ণও বস্তুভেদে বিভিন্ন। আকাশের নীলবর্ণ সমুদ্রের

নীল নহে এবং নীলকণ্ঠের কণ্ঠ এতদুভয় হইতেই স্বতন্ত্র। শ্বেতকায় মানব শ্বেতকায় গোবৎসের সহিত একবর্ণ নহে, এবং দুগ্ধ, তুষার, ধবল বস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় শ্বেত পদার্থ মানবের শ্বেতবর্ণের চিত্র নহে। আমাদের দেশের গৌরবর্ণে হরিদ্রার ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়, তাই বলিয়া তাহা হরিদ্রারঞ্জিতবৎ নহে। শ্যামবর্ণও সেইরূপ যতই শ্যাম হউক্ না কেন, মসীর মতও নয়, অঙ্গারসদৃশও বলা যায় না। সাহিত্যে এরূপ সাদৃশ্যগত অতিশয়োক্তি তাদৃশ দোষের নহে, কারণ, সাহিত্য পাঠকের মনে এই সকল সাদৃশ্যের দ্বারা বস্তুর যথার্থ চিত্রগ্রহণে বিঘ্ন উৎপাদন করে না। কিন্তু চিত্রে এ সকল আতিশয্য সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য—চিত্র বস্তুকেই যথাযথ চিত্রিত করে।

ইহাও কে না জানে যে, নীল অথবা হরিদ্বর্ণ মানব আমাদের কাহারও মনে কোনরূপ সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিতে পারে না? কৃষ্ণ যদি আকাশের মত নীল হইতেন তাহা হইলে কি সমস্ত গোপাকুল তাঁহার জন্য কুলমানে জলাঞ্জলি দিতে বসিত? না, গৌরাঙ্গী রাধিকা অহর্নিশি গুরুজন ও ননন্দার বাক্যবাণ সহ্য করিয়াও ঐ শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত শরীর মন আত্মা সমর্পণ করিতেন? নীল মানববর্ণের কোনও আকর্ষণ নাই। কৃষ্ণবর্ণে একটি সুকুমার উজ্জল লাবণ্য দেখা যায়, তাহাতে একটি প্রশান্ত কমনীয়তা আছে। সেই জন্যই মহাভারতকার সাহস করিয়া কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকে কবি নারীসৌন্দর্য্যের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও অম্লান রাখিয়াছেন।

কিন্তু এ সকল ত গেল প্রেমসিক্ত সৌন্দর্য্যের কথা। যখন করাল কালিকার ভীষণ ভাব ব্যক্ত করিতে হইবে তখন একটু অস্বাভাবিক কালো না করিলে চলিবে কেন? সে উলঙ্গিনী উন্মাদিনী মূর্ত্তি দু'এক পোঁছ আলকাতরা নহিলে ত খুলে না। কিন্তু কালীর ভীষণতা ব্যক্ত করিতে হইলে এই অমানুষিক মিথ্যাবর্ণের আশ্রয় লইতে হইবে এ কথা নূতন। ভীষণতা তাঁহার কিসে ব্যক্ত হয় নাই? নারীহৃদয় কঠিন হইয়া গিয়া শুধু শোণিতলালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে এ দৃশ্য ভীষণ নহে? যে বক্ষে সন্তান স্নেহ পান করিয়া পরিপুষ্ট হইত, সে বক্ষ জুড়িয়া সহস্র নৃমুণ্ড হইতে তপ্ত রক্ত ঝরিতেছে—ইহাতে কি ভীষণতার অভাব আছে? সে কৃপাণহস্তা উলঙ্গিনী মূর্ত্তিই কি যথেষ্ট ভীষণ নহে? যে চিত্রকর শ্যামার দৈহিক গঠনে সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ করিয়া, জিহ্বাকে স্বাভাবিক বিস্তৃত করিয়া দিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে অস্বাভাবিক বং লেপন করিয়া তাঁহার ভীষণতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে চিত্রকরের প্রতিভার প্রশংসা করা যায় না।—সাহিত্যের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া এবং নিরক্ষর কুম্ভকারগণের পদানুসরণ করিয়া আমাদের চিত্রকরেরা এই ত্রুটিগুলি ঘটাইয়াছেন।

চিত্রকরের প্রথম কর্ত্তব্যই এই যে, এই সকল দেবদেবী-সৃষ্টির মূলে যে সৌন্দর্য্যকল্পনা নিহিত আছে সেইটিকে আয়ত্ত

করা। নহিলে, অসংখ্য সরল এবং বক্র রেখাপরম্পরার সমাবেশেও চিত্র কখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের চিত্রকরদিগের হস্তে মহাদেবের যে সকল দুর্দশা ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মহাদেব আমাদের পুরুষসৌন্দর্য্যের চরম আদর্শ। কেবলি দৈহিক গঠনে নহে, অন্তরের ভাবে ও বাহিরের চালচলনেও তিনি পরম পুরুষ। একদিকে বৈরাগ্য, অন্যদিকে গার্হস্থ্য, এবং সেই অবিচলিত চরিত্রে উভয়েরই সমান প্রতিষ্ঠা। তাঁহার গৃহিণী অন্নপূর্ণা, অনুচর নন্দী ভৃঙ্গী, তিনি স্বয়ং ভোলানাথ শিব সদানন্দ। নিজের জন্য তাঁহার কিছুই নাই। সর্ব্বস্ব অন্নপূর্ণার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া শিব ভিখারী।

এই যোগী-গৃহস্থ আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। গৃহে গৃহে শুভ্রবসনা কুমারীরা এই আদর্শের অনুরূপ পতিকামনায় নিত্য শিবপূজা করে। ঐ রূপ, ঐ অনিন্দিত উদার স্বভাব, ঐ অতুল প্রতাপ এবং ক্ষমাশীল ধৈর্য্য নারীহৃদয়ের সমস্ত পূর্ণ করিয়া আছে।

কিন্তু চিত্রপটে পেশীবিহীন গঠন, বাবু-মুখশ্রী, তাম্বূলরাগরক্ত অধর এবং নিষ্প্রভ ভাব মন্থন করিয়া এ শিবত্বের কিছুই পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ভাব সম্বন্ধে আমাদের চিত্রকরেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নহিলে, মদনভস্মের চিত্রে চিত্রকর মহাদেবের ললাটদেশ হইতে একটি তাম্রলোহিত ঝাঁটা বাহির

করিয়া দিবেন কেন? যে দীপ্ত রোষানলে মদন ভস্ম হইয়াছিল ইহাতে তাহা প্রকাশ পায় নাই, প্রকাশ পাইয়াছে কেবল উক্ত স্থূলকায় ঝাঁটা—যাহার অগ্রভাগে অগ্নি সংযুক্ত হইয়া মদনকে দগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

শুধু শিব নহে, দেবতাদের অনেকেই এইরূপ চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া বহুবিধ বিকৃতি লাভ করিয়াছেন। দেবীগুলির উল্লেখ না করাই ভাল—আমাদের চিত্রশালায় এমন একখানি চিত্র নাই যাহা দেখিয়া দেবীকে দেবকুলোদ্ভবা বলিয়া মনে হয়। বোধ করি, চিত্রকরেরা যদি কিছুকাল স্ব স্ব মানসী সৌন্দর্য্যকে মনান্তরিত করিয়া দিয়া মানবী মণ্ডলে দেখিয়া চিত্র আঁকিতে সুরু করেন, তাহা হইলেও দেবতারা ইহলোকে কতকটা প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন।

এবং সেই সঙ্গে দেশের সর্ব্বসাধারণেরও কিছু উপকার হয়। দেবতায় ভক্তি স্থাপন করিতে গিয়া পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিৎ বিকৃতিতে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্তরে সৌন্দর্য্যের একটি অক্ষুণ্ণ আদর্শ জাগ্রত হইয়া উঠে। এবং এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দরতর করিয়া তোলে।

চিত্রকরের হস্তে এই এক মহা সংস্কার নির্ভর করিতেছে। সাহিত্যকারের দায়িত্ব অপেক্ষা তাঁহার দায়িত্ব কম নহে। সাহিত্য বরঞ্চ অনেকের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সময় লাগে।

চিত্র আপন নির্দ্দিষ্ট গঠনপ্রভাবে সহজেই অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই জন্যই বিশেষতঃ চিত্রকরেরা যখন সাহিত্যের সুন্দর আদর্শকে নষ্ট করিতে বসেন তখন তাঁহারা দেশের যে কতদূর ক্ষতি করেন তাহা বলা যায় না। একটি রাজনৈতিক অধিকার লাভ অপেক্ষা জাতির হৃদয়ে একটি সুন্দর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা গুরুতর কার্য্য। এই গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের প্রাচীন সৌন্দর্য্যসমূহকে যে চিত্রকর অক্ষুণ্ন বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি দেশের একজন মহাত্মা।

---

সমাপ্ত।